সপ্তর্ষির কথা

অমরনাথ মুখোপাধ্যায়
শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা — ৬

প্রকাশ করেছেন—সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়
বেদান্তবাগীশ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
১৪, চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৫৫

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
শ্রীঅনিল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পচ্ছদপটের ব্লক ও মুদ্রণ
বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

দাম দেড় টাকা

মুদ্রাকর - শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান
নিউ স্বরসতী প্রেস
১৭, ভীমঘোষ লেন, কলিকাতা

শ্রীমতী বিজলী দেবীকে—

প্রকাশকদের কথা

এই রকম একখানি পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা আমরা করি গত ডিসেম্বর মাসে। শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হয়। অমরবাবু গান্ধীজি ও জহরলালের চরিত্রালেখ্য শেষ ক'রে সময়াভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আর সকলের আলেখ্য চিত্রণে অপারগতা জানান। তখন শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর বাকি পাঁচজন ঋষির ঋষিত্ব মাপবার ভার দেওয়া হয়। শান্তিবাবুরও মাপামাপি ক'রে ফলাফল আমাদের হাতে তুলে দিতে নির্দিষ্টের পরিবর্তে অনির্দিষ্ট সময়ই লাগে। ফলে আলেখ্য-চিত্রণ ও মুদ্রনালয়ে প্রেরণ একই সঙ্গে চ'লতে থাকে।

পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ তখন মুদ্রণযন্ত্রের প্রথম বা দ্বিতীয় স্পর্শ পেয়েছে, এমন সময় গোড়্সের গুলি ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্নকে জ্যোতির্ময় লোকে পাঠিয়ে আমাদের দারিদ্রের নগ্নরূপকে দেশবিদেশের সামনে আরও জঘন্যভাবে ফুটিয়ে তোলে। ফলে অমরবাবুকে বর্তমানের সঙ্গে তাল রাখবার প্রচেষ্টায় গান্ধীজির চরিত্রালেখ্যের খানিকটা বাদ দিয়ে কয়েক লাইন জুড়ে দিতে হয়। এইজন্য রচনাটা হয়ত' খাপছাড়া ব'লে মনে হ'তে পারে।

সপ্তর্ষি ব'লে যে সাতজনকে বাছা হ'য়েছে তা' নিয়ে বা 'সপ্তর্ষির কথা' নাম নিয়েই হ'য়ত মতবিরোধ হবে। বিরোধীদলের অধিকাংশ নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে বাদ দেওয়ায় অসন্তুষ্ট হবেন। নেতাজী কি ঋষির পর্যায়ে পড়েন না? অনেকের মতে তিনিই হ'লেন সপ্তর্ষির উজ্জলতম তারকা। বাদ দেওয়ার অন্য কোন কারণ নেই—আমরা যখন পুস্তকখানির

পরিকল্পনা করি তখন ঠিক হয় যে জীবিত সাতজনেরই আলেখ্য রচনা করা হবে। পরে অবশ্য গান্ধীজির মহাপ্রয়াণে আমাদের পরিকল্পনা বাধ্য হ'য়েই পরিবর্তিত হয়।

সপ্তর্ষি যখন আকাশে ওঠে তখন দেখতে হয় কতকটা একটা নোট্ ওফ্ ইন্টারোগেশন্ বা প্রশ্নচিহ্নের মত—অর্থাৎ সপ্তর্ষির কথা প্রশ্নে বোঝাই। 'সপ্তর্ষির কথা' অনেকের কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন তুলবে যে কায়েদে আজাম্ জিন্নাকে ঋষির দলে ফেলা হ'লো কেন? বিপক্ষ দল ব'লবেন যে তিনিই মহর্ষি—ভারতের নয়, সারা এশিয়ার মহত্তম পুরুষ। এই রকম উত্তর বা দক্ষিণ মেরু-মতাবলম্বীদের সঙ্গে হাত না তুলে অধিকাংশ নিরপেক্ষ চিন্তাশীলদের মত' আমাদের মত (যদিও চিন্তাশীলতার ধারে কাছেও আমরা ঘেঁসতে পারি নি) যে কায়েদে আজাম্ সত্যিই কায়েদে আজাম্—দি গ্রেট্ লীডার এবং এক রাষ্ট্রের সংস্থাপক। সুতরাং তাঁকে বাদ দেওয়ার মানেই হ'লো নিজেদের সংকীর্ণতার পরিচয় দেওয়া।

এগুলো, আগেই বলেছি, চরিত্রালেখ্য বা কারেক্টার স্কেচেস্—জীবনালেখ্য বা বায়োগ্রাফিক্যাল স্টাডি নয়। চরিত্রের আলেখ্যর মধ্যে জীবনের যে দু' একটা টুকরো টুকরো ঘটনা এসে প'ড়েছে তা কেবল চরিত্র-চিত্রণকে পরিস্ফুট ক'রবার জন্য। এ ধরণের চরিত্রালেখ্য বাংলায় বিশেষ নেই অথচ ইংরেজীতে এই ধরণের বইএরই বিশেষ চাহিদা।

পূর্বেই ব'লেছি, প্রথম লেখক প্রথম দু'জনের এবং দ্বিতীয় লেখক পরের পাঁচজনের চরিত্রের ও ধ্যানধারণার চিত্র এঁকেছেন। দু'জনের লেখার ধরণ ও ভাষাকে একই ছাঁচে ঢালবার বিশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও পার্থক্যটা দুই ব্যাপারেই সহজেই নজরে প'ড়বে।

এই সাতজন ঋষির কথা যদি আদৃত হয় (প্রকাশকের কাছে 'আদৃত' কথার অর্থ বই বিক্রী হওয়া) তবে আমরা আরও সাতজন ঋষির কথা শোনাব পরবর্তী খণ্ডে। অনন্তাকাশে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা মোট সাতজন ঋষির কথা জানলেও ভারতের পুণ্যভূমিতে আরও অনেক সাম্প্রতিক ঋষির কথা আমরা জানি। তাঁদের চরিত্রও বাংলার পাঠক পাঠিকাদের কাছে ধরবার মত।

দায়িত্বজ্ঞানহীন চিন্তা ও অসংযত বাক্য আমাদের জাতীয় জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য। এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অসংযম হ'লো অজ্ঞতার এবং বিচারবুদ্ধির অভাবের ফল। অথচ বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধারও একান্ত অভাব। ট্রামে, বাসে, হাটবাজারে, আটচালাতে, কাঠের গোলায়, রেশন সপে এইজন্যই নানারকম অদ্ভুত উক্তি শুনতে পাওয়া যায়ঃ প্যাটেল—ক্যাপিট্যালিষ্ট কি গ্রেট্, গান্ধী পয়লা নম্বর হিন্দু বিদ্বেষী, জহরলালের ফরেন পলিসি দেশের সর্বনাশ ক'রবে, আজাদ পাকিস্থানে যাকনা কেন……ইত্যাদি। আমাদের এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য হ'লো জনসাধারণের চিন্তাধারাকে নিরপেক্ষতার পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা।

ছাপার ভুল—বাংলা বইএর যা বিশেষত্ব—তা থেকে আমরা মুক্ত হ'তে পারিনি। হাজার হ'লেও আমাদের দায়িত্বজ্ঞান ত' বাঙ্গালীর দায়িত্বজ্ঞানকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনা। ইতি

উত্তরপাড়া | সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়

জন্মাষ্টমী, ১৩৫৫

সপ্তর্ষির কথা

মহাত্মা গান্ধী

"দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে ? বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার,
কারাগার করে অভ্যর্থনা"।

ঐতিহাসিক লিখেছেন,

"অভিষেকের পর মহারাজ অশোক কলিঙ্গ-বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। কলিঙ্গবাসীরা প্রাণপণ যুদ্ধ করিল, প্রাণ দিল কিন্তু অশোকের বিজয়াভিযানে বাধা দিতে পারিল না। রক্তস্রোত বহিল নদী বহিয়া, আহত ও পীড়িতের চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হইল। কিন্তু অশোকের সাম্রাজ্য আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত হইল।

কালের করালমূর্তি দেখিয়া চণ্ডাশোকের মনে একটি প্রশ্ন জাগিল—'এত রক্ত কেন ?'

উত্তর আসিল, 'মহারাজ, এ আপনার সাম্রাজ্যবিস্তারের মূল্যস্বরূপ অগণিত নিরুপায়, নিঃসহায়ের দান।'

অশোক প্রশ্ন করিলেন, 'এত রক্তস্রোতে আমার সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া গাঁথিয়া তুলিতে পারিব কি ?'

উত্তর আসিল, 'না, পাপের দ্বারা, অন্যায়ের দ্বারা মহৎ কিছু করা যায় না।'

আবার প্রশ্ন হইল, 'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?'

উপগুপ্ত বলিলেন, 'পথ আমি দেখাইয়া দিব—আমার সঙ্গে আইস।'

অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন। বুদ্ধের বাণীপ্রচার তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল, মানবের সেবা হইল তাঁহার পরম ধর্ম। চণ্ডাশোক হইলেন রাজর্ষি অশোক এবং তাঁহার······'কীর্ত্তি গাহিল গান্ধার হতে জলধিশেষ।'

ভবিষ্যকালের ঐতিহাসিক লিখবেন,

"কি করিয়া গান্ধীজি একজন অটল রাজভক্ত হইতে ইংরাজজাতির প্রতি অসহযোগী ও অনাপোষী কঠিন মনোভাবের অধিকারী হইলেন তাহা তাঁহার নিজের বিবরণী হইতেই জানা যায়। ডাক্তার জন মোট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা সৃজনীশীল অভিজ্ঞতা কি? মহাত্মা গান্ধী তাহার এই উত্তর দেন ঃ

"ঐ ধরণের অভিজ্ঞতা আমার অসংখ্য। কিন্তু আপনি যখন ঐ প্রশ্নটী আমাকে ক'রেছেন তখন আমি একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার উল্লেখ ক'রব যা আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। ঐ ঘটনাটি আফ্রিকায় পা দেবার সাতদিন বাদেই আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। আফ্রিকায় আমি নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই গিয়েছিলাম। আমি তখন একজন বিলাত-

ফেরৎ যুবক, কিছু টাকা রোজগারের চেষ্টা ক'রছিলাম। আমার মক্কেল, যিনি আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন, হঠাৎ আমাকে ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া যেতে আদেশ দেন। যাত্রাপথ সুগম ছিল না। রেলপথে চার্লস-টাউন পর্যন্ত যাওয়া যেত। তারপর ঘোড়ার গাড়ীতে জোহান্স্বার্গ যেতে হ'ত। ট্রেনে আমার প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল, কিন্তু শয্যার টিকিট ছিল না। মেরিজ্বার্গে যখন শয্যা দেওয়া হয় তখন গার্ডসাহেব এসে আমায় বার করে দেন ও মালগাড়ীতে আশ্রয় নিতে আদেশ দেন। আমি যেতে রাজী হ'লাম না, এবং ধোঁয়া ছেড়ে রেলগাড়ী আমাকে ফেলে রেখে চ'লে গেল। আমি শীতে কাঁপতে লাগলাম। তারপর আমি অন্ধকার বিশ্রামঘরেতে প্রবেশ ক'রলাম। দেখলাম সেখানে একজন সাদা-চামড়া ভদ্রলোক র'য়েছেন। আমি সাদা-চামড়ার ভয়ে ভীত হ'লাম। এখন আমার কি কর্তব্য?—আমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা ক'রলাম। আমার কি ভারতে ফিরে যাওয়া উচিত, না ভগবানকে সামনে রেখে আমার ভাগ্যে ঘটে ঘটুক ভেবে এগিয়ে চলা উচিত? আমি ঠিক ক'রলাম যে আমি থাকব এবং নির্যাতনই সহ্য ক'রব। সেইদিনই আমার কার্যকরী অহিংসা মন্ত্রের জন্ম।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই এবং অনুরূপ ঘটনা গান্ধীজির মনে একটা প্রশ্ন তোলে—'এত অন্যায় কেন? এত অবিচার কেন, কেন সাদা কালোয় এত প্রভেদ?' প্রশ্নের উত্তর গান্ধীজি পান

নিজের মনের ভিতর হইতে, ‘লোভ ও হিংসা অত্যাচার ও অনাচারের রূপ গ্রহণ করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত আসন হইতে সরাইয়া দিয়াছে বলিয়া।’

গান্ধীজি আবার প্রশ্ন করেন, “এর প্রতিকার ?”

উত্তর আসে, “অহিংসার দ্বারা সত্যসাধনা।”

প্রশ্ন হইল, “এর মুল্য ?”

উত্তর আসিল “সীমাহীন ত্যাগ।”

সেইদিন হইতে মহাত্মা সত্যসাধনার পথে অগ্রসর হইলেন। আর সত্যসাধনার পথই যে অহিংসার পথ! তিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার এম্, কে, গান্ধী, পরে জগৎ জানিল তাঁহাকে মহাত্মা গান্ধী বলিয়া।

ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক ইতিহাসের মালমশলা ঘেঁটে এইরকমই লিখবেন। আর আমরা যারা তাঁর কর্মপ্রতিভার সমুদ্রের তীরে ব'সে আছি তাদের মালমশলা ঘাঁটতে হবে না— চাই শুধু একটু অনুভূতি! এই অনুভূতির বলেই জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া যাবে।

আমাদের এই অশান্ত ও উদ্বেলিত জগতের সম্মুখে তিনি দুই মূর্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথম হ'ল ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে আর দ্বিতীয় হ'ল এক নূতন সভ্যতার ও নূতন সমাজদর্শনের দার্শনিকরূপে।

জগতে নূতন এক স্বর্গ-সৃষ্টির সমস্যা যুগে যুগে মানুষকে ব্যাকুল করে তুলেছে। যুগে যুগে ধর্মপ্রচারক, দার্শনিক,

জননেতা এই একই রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন ঃ এই যে অত্যাচার এর প্রতিকার কি ? মানুষকে কি ক'রে প্রগতির পথে এগিয়ে দেওয়া যায় আর কি ক'রেই বা সেই প্রগতির গতি অব্যাহত রাখা যায় ? মানুষের নিঃশঙ্কতা কি শুধু সুসংবদ্ধ হিংসাকে মূল্যস্বরূপ দিয়েই পাওয়া যায় ? ইতিহাস কি কেবল রক্তস্রোতের ধারা ? বিজাতিবিজিত দেশের অর্দ্ধউলঙ্গ ফকির এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষ একটী দেশ যেখানে শান্তির বাণী চিরকালই রণদামামার শব্দকে ছাপিয়ে লোকের মনে প্রবেশ করেছে এবং যেখানে পদকসম্মানিত সেনাপতির চেয়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বেশী পূজ্য, বেশী আদরনীয়। এখানে বিজয়সেনের বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা জয় ক'রলেও, সেই কাহিনী কেবল ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকেই লেখা থাকে ; কিন্তু লোকে কথায় কথায় বলে, 'কবীরজীকি বচন শুনিয়ে'। এখানে বিজয়সেনের চেয়ে কবীর বড়, শিবাজীর চেয়ে শ্রীচৈতন্য, আর সৈনাধ্যক্ষ কেরিয়াপ্পার চেয়ে ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ। গান্ধীজি যে এই দেশেই জন্মাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি ?

সাধারণতঃ এইরকমই ঘটে থাকে যে বিদ্রোহীরা জন্মান রক্ষণশীল পরিবারে। বুদ্ধ জন্মেছিলেন ভোগৈশ্বর্যের মাঝে, আর তিনিই দিয়ে গেলেন জগৎকে ত্যাগের মন্ত্র। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য। নানক জন্মেছিলেন এক ব্যবসায়ী গৃহস্থ পরিবারে, কিন্তু শিখিয়ে

গেলেন যে কি করে গৃহহীন অব্যবসায়ী হ'তে হয়। রামমোহন রায়ের জন্ম গোঁড়া হিন্দুপরিবারে, কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের গোঁড়ামীর ভিতে নাড়া দিয়ে গেলেন। গান্ধীজিরও জন্ম ও এক ঐ রকম পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে। উনিশ বছর বয়সে যখন তিনি বিলাত যাত্রা করেন তখন তিনি বিবাহিত ও এক সন্তানের পিতা।

উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পেয়েছিলেন সত্যানুসরণের কঠিন শিক্ষা—যে যত কিছু অপরাধ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় মাথা তুলে দাঁড়াবে। আর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন অসাধারণ ধর্মাসক্তি ও অসীম তিতিক্ষা। স্কুলে, বিলাতে আইনজীবিদের সভায় প্রভৃতি কয়েকটী ঘটনায় তাঁহার সত্যানুসরণের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আসল মানুষটী লুকিয়ে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় রেলের উদ্ধত ইংরেজ গার্ড যখন গান্ধীজিকে বের করে দেয় তখন সে ভাবতেও পারেনি যে সে নূতন ইতিহাসের সূত্রপাত করলে। রবার্ট ক্লাইভকে ভারতে পাঠালেন তাঁর বাপ-মা তাঁর দুরন্তপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে। সেদিন তাঁরা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে ভারতের ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের সূচনা হোল?

দক্ষিণ আফ্রিকায় কালা-আদমীদের ফুটপাথ্ দিয়ে হাঁটবার উপায় ছিল না। গান্ধীজি হাঁটবার চেষ্টা করাতে গান্ধীজিকে প্রহার সহ্য ক'রতে হয়েছিল। 'কুলি ব্যারিষ্টার' যাতে

আদালতে আইন ব্যবসা না ক'রতে পারেন তার জন্যে শতরকম চেষ্টাই করা হয়েছিল। কিন্তু এ সব কোন কাজেই এল না। ভয়? ভয়ে আফ্রিকা ছাড়তে হবে? ভয়ে অন্যায়কে স্বীকার করে নিতে হবে? না কখনই নয়! নিপীড়ন যত কঠিন হয় গান্ধীজির সংকল্প হয় ততই দৃঢ়। মানুষে মানুষে এই যে সম্বন্ধ এ এত বেদনাদায়ক কেন? সেই বেদনা দূর ক'রবার জন্যে গান্ধীজি শত অপমান ও নির্যাতন সত্বেও প্রায় দুই দশক দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে গেলেন। এইখানেই তাঁর মানব-সম্বন্ধ-পরিবর্ত্তনের অস্ত্র 'সত্যাগ্রহে'র জন্ম।

মহাভারতের একটী প্রধান শিক্ষা হোল যে 'অহিংসা সর্বপ্রধান কর্তব্য।' জীবনে এই শিক্ষার প্রয়োগকে সত্যাগ্রহ বা আত্মার শক্তি বলে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে এ দাঁড়িয়ে আছে যে জগৎ সত্যের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। অসত্য কথার অর্থ হোল অস্তিত্বহীনতা। ভগবানই বাস্তব। স্বাতন্ত্র্যের ও ভালবাসার ইচ্ছা এই বাস্তবতারই নামান্তর। এই ইচ্ছাকে যে অস্বীকার করে সে নিজেকেই অস্বীকার ক'রছে। ঐ যে মূক, অসহায় ওরাই প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী কারণ শক্তিশালী যে সে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের শক্তির ক্ষয় করে ফেলবে? মাটীর প্রদীপ যেমন অন্ধকার থেকে বাঁচতে গিয়ে, বাঁচাতে গিয়ে নিজে যায় ক্ষয় হয়ে আলোক বিকিরণ ক'রে। শেষ পর্যন্ত মানুষ, যারা অস্তিত্বহীনতায় বিশ্বাস করে, ঘৃণায় বিশ্বাস করে,

হিংসায় বিশ্বাস করে—তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। পরিচালিত হয় তাঁদের দ্বারা, যাঁরা বিজ্ঞতাকে করেন পূজা, ভালবাসাকে জ্ঞান করেন ধর্ম ব'লে, আর সবার উপর স্থান দেন অন্তরের ও বাহিরের শান্তিকে।

এই যে বাস্তবতা এর ভিতরে শিকড় প্রবেশ করিয়ে বসে সত্যাগ্রহ। এ কেবল হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকার অস্বীকারার্থক গুণ নয়, এ হোল মঙ্গল করবার স্বীকারার্থক শক্তি। আঘাতের প্রতিশোধ আমি নেব না, কিন্তু আমার নির্যাতন সহের দ্বারা, আমার তিতিক্ষার দ্বারা, আমার ভালবাসার দ্বারা আমি আমার আঘাতকারীর মনপ্রাণ হরণ করব। এই পথই হোল আমাদের তরঙ্গিত জগতের যত কিছু সংঘাতের সুন্দরতম মীমাংসার পথ। শত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও এই হোল সান্ত্বনার বাণী যে মানবতা রয়েছে বেঁচে, চাষার মধ্যে, তাঁতীর মধ্যে, শিল্পীর মধ্যে, বৈজ্ঞানিকের মধ্যে—সবারই মধ্যে। এর পবিচয় আমরা পাই তখনই যখনই তারা ভালবাসে ও নির্যাতন সহ্য করে। তারা কি ভালবাসা ও নির্যাতন সহ্য করা চরিত্রের অঙ্গ ক'রে নিতে পারে না? এইটাই হ'ল মানবহিতৈষীদের চিরন্তন প্রশ্ন। মহাত্মা বলেন, "হ্যাঁ পারে, সীমাহীন ত্যাগের দ্বারা তারা সত্যকে চিরপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারে।"

বহিঃশক্তির ব্যবহারের সপক্ষে যাঁরা তাঁরা বলেন: জীবন একটা সংগ্রাম। এখানে যে যোগ্য তারই বাঁচবার, তারই কেবল থাকবার অধিকার। জীবজগতের এই যে সামান্যীকরণ

এ মানুষের রাজ্যে চলে না—একথা ঐ মতাবলম্বীরা ভুলে যান—সম্পূর্ণ ভুলে যান। মানুষের জীবনকে কি কেবল জৈব অস্তিত্বের আবেষ্টনীর মধ্যে আনা চলে? মানুষ যে জীব ছাড়া আরও কিছু। জৈব গুণাগুণ ছাড়াও যে তার মধ্যে প্রজ্ঞা আছে। ডারউইন মতাবলম্বীরা একথা স্মরণ করতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন।

মহাভারতে যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীকে একটী কুকুরশালার সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে। সেখানে "প্রথমে হয় লেজনাড়া, তারপর ডাকা, তারপর ডাকের প্রত্যুত্তর, তারপর অপরের দিকে ঘুরে দাঁড়ান, তারপর দন্তপ্রদর্শন, তারপর চীৎকার, এবং অবশেষে সুরু হয় যুদ্ধ। মানুষের বেলাতেও এই ব্যাপারটী ঘটে থাকে। কোন ব্যতিক্রম হয় না।"

গান্ধীজি ব'ললেন, 'কেন আমরা বাঁদরের মত, কুকুরের মত লড়াই করে বেড়াব? এস আমরা মানুষের মত ব্যবহার করি; এবং স্থির, শান্তভাবে নির্যাতন সহ্যের দ্বারা ন্যায়ের পূজা করি। শত্রুকে ধ্বংস না ক'রেও আমরা তার পরিবর্তন সাধন ক'রতে পারি—হাজার হ'লেও সে ত' আমাদেরই মত মানুষ।'

ভালবাসার যে রীতির কথা বলা হ'ল, তা অনেকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু গান্ধীজি ওই রীতিকে রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির পন্থা হিসাবে গ্রহণ ক'রেছেন এবং সফলকাম হয়েছেন অনন্যসাধারণরূপে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয়েরা এই রীতির ব্যবহার

ক'রেছিল এবং তাদের অনেক অভিযোগের প্রতিকারও ক'রেছিল এরই দ্বারা। পৃথিবীর ন্যায় ও অহিংসা-সংগ্রামের ইতিহাসে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের 'জোহান্‌স্‌বার্গ মার্চ্' অক্ষয় অক্ষরে লেখা থাকবে। আগে চ'লেছেন 'কুলি ব্যারিষ্টার' গান্ধী; পিছনে চলেছে নিরস্ত্র, নিঃসহায় আবালবৃদ্ধবনিতার জনসমুদ্র। মনে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অটল সংকল্প—হয় জোহান্‌স্‌বার্গ, নয় পথে মৃত্যুবরণ। যাত্রাপথে কত বুভুক্ষু, কত রোগী ক'রলে প্রাণত্যাগ, কত শিশু মায়ের বুকে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে প'ড়ল। চিরনিদ্রিত সন্তানকে বুকে চেপে ধ'রে মাতা তখনও চলল এগিয়ে। চিরদিনের জন্য নামালেই যে একবার শেষ কাঁদন কাঁদতে হবে—তার সময় কই? দু' এক ফোঁটা চোখের জল হয়ত মাটীতে পড়েছিল, তা হয়ত উষ্ণ মরুভূমির বালুকায় বাষ্প হ'য়ে উড়ে গেছে। ইতিহাস তার কোন তল্লাস নেয়নি।

রাষ্ট্রনৈতিক কোনপ্রকার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে বহিঃশক্তির প্রয়োগের প্রয়োজনই হয় না, একথা প্রমাণ করবার জন্য তিনি এক নূতন অস্ত্রের সৃষ্টি ক'রেছেন যার সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কোনো সংঘাতই নেই বরং ঐ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য থেকেই এর জন্ম।

এই যে অস্ত্র এ নানারকম রূপগ্রহণ ক'রেছে বিভিন্ন সময়ে। কখনও বা নিষ্ক্রিয়-অবরোধ, কখনও অহিংস-অসহযোগ, কখনও বা আইন-অমান্য-আন্দোলন। এর

প্রত্যেকটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত—'অন্যায়কে ঘৃণা করিও, অন্যায়কারীকে নয়'। সকল সময়ই শত্রু যখন বিপদাপন্ন, মহাত্মা গেছেন তার পরিত্রাণে। শত্রুর বিপদে আমার সুবিধার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নেব—এ হ'ল কাপুরুষতা, এ হ'ল অন্যায়। অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা চলে না। শত্রু অবাক হয়, এ আবার কি রকম যুদ্ধ! জেনারেল স্মাটস্‌ও অবাক হ'য়ে ছিলেন, ব্যতিব্যস্ত হ'য়েছিলেন। স্মাটসের একজন সেক্রেটারী গান্ধীজিকে ব'লেছিলেন,—"তোমার লোকদের আমি ভালবাসিনা। তাদের সাহায্য ক'রতে আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক—……কিন্তু উপায় কি? আমাদের বিপদে তুমি যে সাহায্য কর। কেন তুমি বিলাতের ধর্মঘটীদের পন্থা অবলম্বন ক'র না? কেন তুমি আমাদের ক্ষতি কর না? যদি ক'রতে আমাদের পক্ষে কত ভাল হ'ত; কিন্তু এই পথ অবলম্বন ক'রে তুমি আমাদের নিরুপায় করে তুলেছ।"

এই বিশ শতকের বিজ্ঞানের যুগে আমরা অনেক কথাই জোর গলায় প্রচার ক'রতে শুনেছি। সাম্রাজ্যের কঠিন ভিত্তির উপর ব'সে সাম্রাজ্যবাদের নিন্দাও শুনেছি। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণান্ একে তাসের জুয়াখেলার সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন। অনেক সময় জুয়ার নিন্দা করেন তাঁরা যাঁরা জুয়ার অর্থ নিজের তহবিল্‌গত ক'রেছেন। তাঁরাই হাঁসেন, তাঁরাই আশ্চর্য হন, অপরে জুয়াখেলার দিকে ঝুঁকেছে ব'লে। তাঁরা ভুলে যান যে তাসের জুয়ায় যারা হারে তারা পুনরায় খেলে ক্ষতিপূরণ

করতে চায় ; না পারলে গোলমাল বাধায়। এই গোলমাল থামতে পারে না যদি না জুয়ার অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। গান্ধীজি ব'ললেন,--জুয়ায় জিতে টাকা কাছে রেখে অনেকদিন ত' সুদ খেয়েছ, এবার ফিরিয়ে দাও বিনা প্রতিবাদে। 'ভারত ছাড়' দাবী এই উপদেশেরই নামান্তর। শুধু 'ভারত ছাড়' নয়, হে সাম্রাজ্যবাদ তোমার অভিধান থেকে সাম্রাজ্য কথাটী বাদ দিয়ে দাও ; মানুষকে মানুষ হতে দাও, তার স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে তুমি বাধা দিও না !

জাতীয় সমৃদ্ধির কথা যখনই আমরা বলি, তখনই আমরা ধ'রে নিই যে অপর জাতির উপর প্রভুত্বের অধিকার আমাদের জন্মগত। আমরা বলি যে—তরবারি দিয়ে যখন জয় করা হয়েছে, তখন তরবারি দিয়েই রক্ষা ক'রব। কিন্তু তরবারি দিয়ে কি সব রক্ষা করা যায়? পৃথিবীর কত সাম্রাজ্য, কত নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'য়ে, বালুকাস্তূপে অন্তর্হিত হ'য়ে কেবল প্রত্নতত্ত্ববিভাগের গবেষণার খোরাক মাত্র হয়েছে !

রোমক সাম্রাজ্যেরও পতন হয়েছিল। গজনীর সুলতান মামুদ সতেরবার ভারত-অভিযান ক'রেছিলেন ব'লে প্রসিদ্ধি আছে। তিনি ভারত থেকে অপরিমেয় ধনরত্ন লুঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। গুজরাঠের সোমনাথ মন্দিরের দরজা তিনিই ভেঙ্গেছিলেন। সমস্ত ধনরত্ন দিয়ে তিনি গজনীকে অপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিতা ক'রেছিলেন। ভারত-অভিযানের এক শতকের মধ্যেই ঘোররাজ্য গজনীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠল। দুই

রাজ্যে বাধল যুদ্ধ। ঘোররাজা জয়ী হলেন এবং সাতদিন ধ'রে অগ্নি ও তরবারির সাহায্যে গজনীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ক'রলেন। সাতদিন আগে যেখানে পুরনারীর নূপুর নিক্কণে সন্ধ্যা মুখর হ'য়ে উঠত, মহবতের সুরে নাগরিকের ঘুম ভাঙ্গত, নকীবের শিঙ্গারবে কর্মব্যস্ততার সাড়া প'ড়ত—সাতদিন পরে সেখানে দিনের বেলায় বিরাট শূন্যতা ও সন্ধ্যাবেলায় শৃগালের উচ্চরব! তাই বলি তরবারি রক্ত নিতে পারে বটে, আবার তার ধার ক'মলে রক্ত দিতেও হয়।

সাম্প্রতিক যুগে পৃথিবী যদি কোন নৈতিক জননেতা পেয়ে থাকে, তবে তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে শিল্পবিপ্লব একটি প্রয়োজনীয় অধ্যায়। শিল্পবিপ্লব ইংরাজজাতিকে অনেক কিছু দিয়েছে। শিল্পোন্নতি পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে। আজ লণ্ডনের অপেরা আমেরিকায় বসে শোনা যায়, ভূমধ্যসাগর তীরের ফল ক্যানাডায় বসে খাওয়া যায়, আমেরিকায় তৈরী মোটর গাড়ীতে কলকাতায় গড়ের মাঠে বিকালে হাওয়া খাওয়া যায় আর চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় ছ'আনা পয়সা ক'রলেই মেট্রোয় ব'সে দুপুরে দেখা যায়। সুতরাং শিল্পপ্রসার মানুষের সুখের প্রধান অঙ্গ। তাই বর্তমান যুগের বাণী হোল "শিল্পপ্রসার কর।" গান্ধীজি ব'ললেন—ভুল! ভুল কারণ শিল্পপ্রসারের একটা দিকই তোমরা দেখেছ। 'আমি শিল্প

প্রসারের বিরুদ্ধে'—একথার অর্থ আমি মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে। যখন তোমরা অপেরা শোন তখন কি তোমাদের বস্তীর কথা স্মরণ হয়? ল্যাঙ্কাশায়ারের মিহি পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে সন্ধ্যায় যখন তোমরা গাড়ীতে চ'ড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাও তখন কি স্মরণ কর যে এই সময় শ্রমিকরা চলেছে মদের দোকানের দিকে, জুয়ার আড্ডার দিকে? না গিয়ে যে তাদের উপায় নেই! শিল্প-প্রগতির নামে সমাজের একটা অঙ্গকে তোমরা ঠকিয়ে আসছ। প্রাসাদোপম অট্টালিকায় শুয়ে তোমাদের কি স্মরণ হয় যে বোম্বে কি আমেদাবাদের কাপড়ের কলের বস্তীতে একটা ছোট ঘরে গড়পড়তা ১০ জন শুয়ে আছে? শিল্পপ্রগতির নামে তাদের দিয়েছ দারিদ্র্য, ব্যাধি, অজ্ঞতা। এই শূন্যতা তারা পূরণ করতে চায় মদ ও তাড়ি খেয়ে, জুয়া খেলে আর অন্যান্যরকম পাপাচরণ ক'রে। ফলে সমাজের উপর দাবী পড়ে হাঁসপাতাল গড়বার, উন্মাদাশ্রম বানাবার; কিন্তু এ যে সমাজের নিজেরই দোষ, নিজের ত্রুটি—এ তোমরা ভুলে যাও!

গান্ধীজি শিক্ষা দিয়েছেন: সত্যের পূজারী হও, সরল হও, হৃদয়ের আকাশ উন্মুক্ত করো, সুখে ও দুঃখে একরকমই থাক, জীবনকে আর ভগবানকে ভালবাস, মৃতুকে ভয় ক'র না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'অহিংসা-অস্ত্র' নিয়ে দাঁড়াও। এর চেয়ে বড় শিক্ষা ইতিহাসের সীমানা দিয়ে ঘেরা যুগে আর কেউ দিতে

পারেন নি। জীবনই তাঁর শিক্ষা। জীবন দিয়েও তিনি কবির বাণী প্রচার করে গেছেন ঃ

“জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর
পেতে হবে তব পরিচয়,
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।”

জহরলাল

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

*   *   *   *   *

আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব

সারারাত ফোটাক তারা নব নব।"

প্রাচীন গ্রীসের স্টোইক্ পণ্ডিতেরা ব'লতেন যে প্রকৃতির একটা আইন আছে—সে আইন অমোঘ, সে আইনের ব্যতিক্রম হয় না। সূর্য পূব দিকে ওঠে ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়—এর কোন ব্যতিক্রম নেই। উত্তর গোলার্দ্ধের সমুদ্রের কোন স্থানে মেঘমুক্ত তারকাখচিত আকাশে গভীর রাত্রে নাবিকেরা যেখানে আজ ধ্রুবতারকাকে লক্ষ্য ক'রবে কালও ঠিক স্থানে ধ্রুবতারকাকে দেখতে পাবে—এরও কোন ব্যতিক্রম হ'বে না। ভোরের রাত্রে শুকতারা যে স্থান থেকে ভাবুকের মনে স্বপ্নজালের সৃষ্টি ক'রবে, পরের বছর এই দিনে ঠিক সেই স্থান থেকে স্বপ্নালোকে ভাবুককে ভাসাবে। প্রকৃতির রাজ্যে এ এক অপূর্ব শৃঙ্খলা! এরকম শৃঙ্খলাই ত' হওয়া উচিত মানুষের রাজ্যে; তবেই ত' মানুষের রাজ্য ন্যায়ের রাজ্য—রামরাজ্য হবে।

রোমান স্টোইক্ চিচেরো এবং সেনেকা বললেন, 'এরকম শুধু হওয়া উচিত নয়, এই রকমই হ'য়েছিল স্বর্ণযুগে। স্বর্ণযুগে মানুষে মানুষে ভেদ ছিলনা তাই ছিলনা হিংসা, দ্বন্দ্ব।

চলার পথ ছিল সুগম। স্বর্ণযুগে মানুষের কার্যপদ্ধতি চ'লত নৈসর্গিক নিয়মের শৃঙ্খলায়—যে শৃঙ্খলা প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত।'

সেনেকা ব'ললেন, 'মানুষের জন্ম ন্যায়ের জন্য, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ন্যায়ের জন্য। এবং ন্যায়ের রাজ্য তখনই সম্ভব যখন মানুষ নৈসর্গিক নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে।'

চিচেরো ব'ললেন, 'তাই স্বর্ণযুগ ছিল ভালবাসার যুগ, নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে, নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে পাবার যুগ।'

এইভাবে রোমান স্টোইক্ কুয়াশার মেঘে ঢাকা স্বর্গ থেকে প্রাকৃতিক আইনকে ধূলিধূসরিত পৃথিবীতে টেনে আনলেন এবং ঘোষণা ক'রলেন যে ঐ আইনের নীতি—সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও মৈত্রী এই উপগ্রহবাসী মানুষ নামক জীবের পক্ষেও প্রযোজ্য।

এ হ'লো স্বর্গকে পৃথিবীতে টেনে আনবার চেষ্টা। এ চেষ্টা ক'রেছেন সক্রেটীশ, করেছেন স্টোইকরা, গৌতম বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট, হজরৎ মহম্মদ, আর ক'রেছেন মহাত্মা গান্ধী। জহরলাল ব'ললেন, স্বর্গকে পৃথিবীতে টেনে এনে লাভ কি? পৃথিবীকেই স্বর্গের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যাক! কুয়াশায় ঢাকা স্বর্গের সৌন্দর্য পৃথিবীতে আনলেই কি পৃথিবী সৌন্দর্যমণ্ডিতা হ'য়ে উঠবে? পৃথিবীর যে নগ্ন কুশ্রীতা আছে, বীভৎসতা আছে

তা যদি দূর করা যায়, তা' হ'লেই সে 'আপনাতে আপনি বিকশিয়া উঠিবে।'

রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কুশ্রীতা দূর ক'রবার চেষ্টা ক'রছেন—দেশের, সমাজের ও জগতের।

এই যে কুশ্রীতা এর বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা এসেছিল বাল্যেই, যখন তিনি প্রবাদপর্যায়ী ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে নিজেকে ভবিষ্যকালের জন্য প্রস্তুত ক'রছিলেন। যে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হ'লেন, সে দিক কোন কাজেই এলনা। নিজেকে গ'ড়ে তুলেছিলেন ভারতের অন্যতম অভিজাত-বিলাসী-ধনীর একমাত্র বংশধররূপে, কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কাটল বন্দীশালায়।

দেশীয় শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত হন নি। শিক্ষা তাঁর পূরোপূরি বিদেশী—ইংরেজ গভর্ণেস ও ব্রুকস এবং হ্যারো ও কেম্ব্রিজের শিক্ষা। এই যে শিক্ষা এ অভিজাতসুলভ বিলাসিতার অন্যতম অঙ্গরূপে কাজে এল না; কাজে এল ভারতে পাশ্চাত্য ভাবধারার আমদানীর সহায়তায়।

অল্পবয়স থেকেই জহরলালের মনে ইংরেজ-বিদ্বেষ জেগে ওঠে যদিও তাঁর পারিবারিক পরিবেশে ঐ রকম হবার কথা মোটেই নয়। তাঁর পারিবারিক পরিবেশে একটি মনোভাব সুন্দরভাবে গ'ড়ে তোলা যেত, তা হ'লো ইংরেজ-প্রীতি। তবুও জহরলালের মনে শুদ্ধোধনের পুত্র বুদ্ধদেবের মত প্রীতির পরিবর্তে মনে জেগে ওঠে বিদ্বেষ। এর কারণ হ'লো তাঁর

উন্মুক্ত হৃদয়ে একটি জিনিস বারবার আঘাত ক'রত তা হলো শাসক ও শাসিতের পার্থক্য। প্যার্কে য়ুরোপীয়দের জন্যে কেন বসবার আলাদা যায়গা থাকবে? ট্রেনে কেন তাদের জন্য আলাদা কামরা নির্দিষ্ট থাকবে?

থাকবে এই জন্য যে শাসিতেরা শাসকের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চ'লতে পারলেও শাসকেরা তা হ'তে দেবেনা —জহরলাল বুঝতে পারেন। এবং ঠিক করেন যে এর প্রতিকার ক'রতে হবে। প্রতিকারের পন্থার নির্দেশ পান কেম্ব্রিজের মজলিসে। কেম্ব্রিজের মজলিসে বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় ও গোখলে প্রতিকারের যে নির্দেশ দিলেন তা হ'লো—শাসিতদের শাসক ক'রে তোলা।

ছেলেবেলা থেকেই তিনটি জিনিসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মায়—সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি। এর মধ্যে রাষ্ট্রনীতির প্রতি আকর্ষণ ক্রমে দুর্বার হ'য়ে দাঁড়ায়। কেম্ব্রিজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের খবর পেতেন এবং চেষ্টা ক'রে সংগ্রহ ক'রতেন। এই প্রাপ্ত ও সংগৃহীত সংবাদের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে আন্দোলনের অন্যরকম রঙীন চিত্র মনে মনে এঁকে যেতেন। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতির গণতান্ত্রিক শিক্ষা তাঁর হৃদয়ের আকাশকে আরও উদার ক'রে তোলে। সেই পটভূমিকায় যে কোন উদার, মহৎ কল্পনার চিত্রকে রঙীন ক'রে তোলা যেত।

ভারতে যখন ফিরে এলেন তখন এই কল্পনায় আঁকা রঙীন

ছবিকে ঝাপসা ব'লে মনে হ'তে লাগল। বাস্তব ও কল্পনায় এত প্রভেদ? আত্‌লান্তিক পারের দ্বীপপুঞ্জে ব'সে যে ছবি তিনি এঁকেছিলেন তা' কঠিন বাস্তবের সম্মুখে এসে অত বর্ণহীন, জ্যোতিহীন হ'য়ে গেল কেন? জহরলাল অবাক হন, বিমর্ষ হন, এবং নিজেকে প্রশ্ন করেন, কেতাদুরস্ত পোষাকে সজ্জিত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ঐ যে বাঁধাধরা মুখস্ত বুলি আওড়াচ্ছেন ঐ কি কংগ্রেসের আসল রূপ? প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে এসেছেন বা পিকনিকে এসেছেন? এই কি কল্পনার ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি? ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন অবাক হ'য়েছিলেন ইয়ারো নদী দেখে এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই কি আমার কল্পনার ইয়ারো?"

সাময়িকভাবে রাষ্ট্রনীতিকে তিনি সেলাম ঠুকলেন এবং ঢুকলেন অভিজাতমূলক বিলাসের আওতায় সম্পূর্ণভাবে। কিন্তু সূর্যের আলোক ত' ঢেকে রাখা যায় না। অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকটী ঘটনা তাঁকে টেনে আনল রাষ্ট্রনীতির ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন এই সময়ে গুমোটভাব কাটিয়ে ঘূর্ণিতে পরিণত হ'য়েছিল। যে ঘটনা দুটি জহরলালকে মাতালে ও বিশেষ ক'রে তাতালে তা হ'লো রাওলাট্ আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ্।

আন্দোলন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকল আর বললে, 'এস জহরলাল তুমি আমার ঘূর্ণিবায়ুর মধ্যে এস। তোমার কি শিকার, পিকনিক, পার্টি নিয়ে থাকা সাজে? তোমার

জন্ম যে মহৎ কাজ ক'রবার জন্যে, ভারতকে নূতন সাজে সাজাবার জন্যে, পৃথিবীর রূপ পালটাবার জন্যে। যে দীপ হাতে দিয়ে দেবতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তার আলোকে তুমি পৃথিবীর অন্ধকার দূর কর। সভ্যজাতিরা বড় বাতি জ্বালিয়ে ভাবছে, জগতে বুঝি আর অন্ধকার নেই—সমস্তই আলোয় উদ্ভাসিত কিন্তু প্রদীপের নীচেই যে অন্ধকার, তা তাদের নজরে পড়ে না। সেই অন্ধকার তুমি দূর কর—জগৎকে দেখিয়ে দাও যে ঐ অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে যত নগ্নতা, যত বীভৎসতা।'

জহরলাল চল'লেন অজানার উজানে। এ উজানে যারা গা ভাসায় তাদের দিতে হয় বিসর্জন অনেক কিছু, ক'রতে হয় ত্যাগ অনেক রকমের। ত্যাগের আবার রকমভেদ আছে। সেই ত্যাগকেই বলি বড়, যেখানে ভোগের সম্ভাবনা ও প্রস্তুতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সব কিছু থেকেও যার কিছুই নেই সেই ত' ত্যাগী কারণ সেই ত' সর্বস্ব বিলিয়েছে; শত প্রলোভনও তাকে ধ'রে রাখতে পারেনি। সে যে গৌতম বুদ্ধের পথে চ'লেছে—ভীরু, শঙ্কিত তৃণ কি তার চলার পথে বাধা সৃষ্টি ক'রতে পারে? পিতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম, ঐশ্বর্যভোগ-মোহ ও জহরলালকে বাধা দিতে পারল না। অপার সৃষ্টির বেদনা বিধাতা যাকে দেন, তার দৃষ্টি ত' পেছন দিকে পড়ে না। সুদূর অলকাপুরীর দিকে তার দৃষ্টি থাকে নিবদ্ধ।

জ্যোতির ধ্রুবতারকা লক্ষ্য ক'রে জহরলালও চ'ললেন। আজও চলার বিরাম নেই।

জীবন তাঁর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব মিলন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন :

"জীবনধারায় আমি প্রাচ্যের চেয়ে প্রতীচ্যেরই বেশী কাছাকাছি, কিন্তু তবুও মনকে আমার গ্রাস ক'রে আছে ভারতবর্ষ, এবং পেছনে কোথাও র'য়েছে এক সঙ্গোপন অবচেতনার স্তরে হাজার বছরের পুরাণো ব্রাহ্মণত্বের স্মৃতি।"

তাঁর কর্মপদ্ধতি ও ভাবধারা ঐ মিলনেরই আর একরূপ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তিনি পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য মতবাদ ও ধারণাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবেসে ফেলেছিলেন। অপরদিকে নিপীড়িত ও অপমানিত জাতির প্রতিনিধি ব'লে নিপীড়িতের ও অপমানিতের ব্যথায় ব্যথী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে তিনি ছিলেন—এ তাঁর আংশিক পরিচয় মাত্র—যেমন কবি ব'ললে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নন, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা ব'ললে আকবরও নন। রবীন্দ্রনাথের বা আকবরের পরিচয় দিতে হ'লে 'একাধারে' দিয়ে আরম্ভ ক'রতে হবে। জহরলালেরও সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হ'লে কংগ্রেস-মেডিকেল-মিশনের সঙ্গে চীন যেতে হবে, স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে উপস্থিত থাকতে হবে, তাঁর মুসোলিনীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান স্মরণ ক'রতে হবে, এবং প'ড়তে হবে তাঁর 'হুইদার ইণ্ডিয়া', 'আত্মজীবনী' ও 'ডিস্‌কভারি অফ্‌ ইণ্ডিয়া।'

জীবনকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন তাই তাকে পূর্ণ ক'রে তুলবার এত চেষ্টা। ষ্টোইক দার্শনিকেরা ব'লতেন যে দেবতারা আছেন কি না, তাতে তাঁদের কিছুই যায় আসে না। যদি দেবতা না থাকেন, তবে দেবতাকে বাদ দিয়েও মানুষের চ'লবে ; আর যদি দেবতা থাকেন তবে তিনি যা পারেন করুন, ষ্টোইক তা সহ্য ক'রতে সকল সময় প্রস্তুত। মানুষের লক্ষ্য হবে—দেবতা নয়, মানুষ ; কারণ 'সবার উপরে মানুষ সত্য।' এই মানুষকেই সুন্দরতম ও পূর্ণ করার উপায় হিসাবে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন—কর্তব্য, আনন্দ নয় ; আর ভোগের মাত্রাকে কমিয়ে প্রাপ্তির সম্ভাবনার মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। ফলে জীবন তাঁদের কাছে হ'য়েছিল রিক্ত ও কঠোর। জহরলালও জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার উপায় হিসেবে কর্তব্যকেই অবলম্বন করেছিলেন ; কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ দ্বারা রিক্ততা বরণকে তিনি কাপুরুষতা ব'লে মনে করেন। ভগবানে প্রয়োজন নেই, কিন্তু মানুষকে মানুষ গ'ড়তে হবে। মানুষ যাতে তার পূর্ণরূপ গ্রহণ ক'রতে পারে, তার জন্যে সংগ্রাম ক'রতে হবে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে! ষ্টোইকদের সঙ্কেতবাণী যে জীবনে কর্তব্যই ধ্রুবতারা, ভোগ নয়—জহরলাল গ্রহণ করেন নি। কর্তব্য কি জন্য ? দুঃখবরণ কি জন্য ? জীবনকে যাতে পূর্ণরূপে ভোগ ক'রতে পারা যায় তার জন্য। হিন্দু ও বৌদ্ধ অধ্যাত্মবিদ্যার শিক্ষা যে মানুষ পৃথিবীতে আসে দুঃখভোগের জন্য, জহরলাল বিশ্বাস করেন না।

তিনি বলেন যে পৃথিবী কদর্য, সন্দেহ নাই, তবুও পৃথিবী মনুষ্য-বাসেরই উপযুক্ত স্থান। রাজপুত-বীরত্বের যুগে মেবারের রাণা বলেছিলেন, মেবার! শতদোষ সত্ত্বেও আমি তোমাকে ভালবাসি! জহরলাল বললেন, পৃথিবী! তোমার কদর্যতা সত্ত্বেও তুমি অতি মনোরম!

ধর্ম সম্বন্ধে তিনি উদাসীন—সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারতের নবরাষ্ট্রকে তিনি ধর্মের আওতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চান। ধর্ম হ'লো মানুষের আভ্যন্তরিক ব্যাপার, মানুষের চৈতন্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে—যে চৈতন্যকে মানুষ মঙ্গলময় ব'লে মনে করে। পরলোককে তিনি থোড়াই কেয়ার করেন, ইহলোকই তার সর্বস্ব। সুনীতি-সম্পন্ন অতিমানবই তাঁর দেবতা। এই যে জীবনদর্শন এ ভারতবর্ষের জীবনদর্শন নয়। তাঁর এই জীবনদর্শনের জন্য দায়ী হ'লো পাশ্চাত্য শিক্ষা। জীবনকে ফলে, ফুলে শোভিত ক'রবার জন্যেই এই জীবন-দর্শনভঙ্গী। এই ভঙ্গীর জন্যে কাঁদ্‌তে হয়, কাঁদাতে হয়, ভালবাসতে হয়। এই জীবনদর্শনের জন্যই মানুষ পাথর কেটেছে, সমুদ্রে ডুবেছে, সমুদ্র পার হ'য়েছে, এর জন্যই মানুষ হিমেল মেরুর দেশে পেঙ্গুইন পাখীর ডাক শুনতে গিয়ে তুষার ঝঞ্ঝায় প্রাণত্যাগ ক'রেছে, ভারতে আসবার রাস্তা খুঁজেছে, বাইশ বছর ধরে তাজমহল গড়েছে, পোটাসিয়াম্ সায়ানাইডের স্বাদ নিতে গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুলি ক'রেছে। এই দর্শনকে বাদ দিলে জীবনে আর কি থাকবে?

জাতীয়তাবাদী নেতা জহরলাল। জাতীয়তাবাদকে সম্প্রতি অনেকে কৃপার চ'ক্ষে দেখেন। তাঁরা ব'লেন যে জাতীয়তাবাদের দিন শেষ হ'য়েছে—সে এখন মৃত্যু অভিমুখে। জাতীয়তাবাদের পরিধি সঙ্কীর্ণ সন্দেহ নেই—কিন্তু তার মধ্যেই সে রসে ভরপূর। তার বিস্তৃতি না থাকলেও সে বৈচিত্র্যহীন নয়। শৃঙ্খলিত জাতির জাতীয়তাবাদ সূর্যের আলোর মতই ভাস্বর এবং নিত্যকালের সত্য ব'লে চিরন্তনের পূজা লাভ ক'রবে। জহরলাল বললেন, জাতীয়তাবাদের পরিধি সঙ্কীর্ণ? বেশ এই সঙ্কীর্ণতা দূর কর, তার বৈচিত্র্যের সঙ্গে বিস্তৃতি মেশাও—তা হ'লেই সমস্ত গোল মিটে যাবে। আন্তর্জাতিকতা শ্রেষ্ঠ কিন্তু জাতীয়তাবাদ যে অতি প্রয়োজনীয়; আন্তর্জাতিকতা ভাল কিন্তু বেঁচে থাকতে যে সকলেই চায়!

প্রতিপক্ষ ব'ললেন, জাতীয়তাবাদ ত' পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারে না।

জহরলাল উত্তর দিলেন, কারাগারেও ত' লোক শান্তিতে বাস করে।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার এই যে সম্পূর্ণ মিলন এ বিশ্বের রাষ্ট্রনীতিতে জহরলালের অনন্যসাধারণ দান।

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে য়ুরোপের গণতন্ত্রগুলিতে আদর্শবাদী নেতার অভাব ছিল না; কিন্তু অভাব ছিল তাঁর যিনি আদর্শবাদকে কোন সময়েই ক্ষুণ্ণ হ'তে দিতে প্রস্তুত নন। বেদনার সঙ্গে জহরলাল লক্ষ্য ক'রলেন যে আদর্শবাদীদের অধিকাংশই

কপটতায় পূর্ণ; প্রয়োজন হ'লে আদর্শবাদকে ছেঁড়া কাঁথার মত পরিত্যাগ ক'রে ভীতির স্তুতি ক'রতে তাঁরা বিন্দুমাত্র পরাঙ্মুখ নন। তিনি দেখলেন যে অনেকদিন ধ'রে যুদ্ধ তাহার করালমূর্তি নিয়ে পৃথিবীর সভ্যতাকে ক'রছে বিধ্বস্ত; ফ্যাসীবাদ ও নাজীবাদের এবং বিশ্বপ্রভুত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধও তিনি দেখেছেন। এই যুদ্ধের মধ্যে অর্ধেক সময় তাঁকে কারাগারে কাটাতে হ'য়েছে।

য়ুরোপে ফ্যাসীবাদ ও নাজীবাদ ক'রল জন্মগ্রহণ; জহরলাল বুঝলেন যে তারা কি ফল প্রসব করবে। যে নীতির ওপর ঐ দুই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত তা জগতের মঙ্গল ক'রতে পারে না। তাই তিনি ক'রতে লাগলেন ঐ দুই 'বাদে'র বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা। জাপান চীন আক্রমণ ক'রল; চীন যথাসাধ্য বাধা দিল কিন্তু লোভের ধ্বংসের গতি রোধ ক'রতে পারল না। ভারত বিচলিত হ'লো। জহরলাল ব্যথিত হ'লেন অনন্যসাধারণরূপে। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস পাঠাল মেডিকেল মিশন্—দুস্থ, বিপদগ্রস্থ, অন্যায়ের কবলে পতিত চীনকে সাহায্য ক'রবার জন্য, যখন য়ুরোপের 'আদর্শবাদীরা' শুধু মৃদু প্রতিবাদ ক'রেই ক্ষান্ত ছিলেন। ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ জহরলালকে ব্যাকুল ক'রে তুলল; এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি মন খুলে তীব্রভাবে লিখলেন। গণতন্ত্রের নেতারা তা শুধু পাঠ ক'রলেন—সৎকার্যে সাহস দেবার সাহসও তাঁদের হলো না। বিশ্বাসঘাতকতায় চেকো-

শ্লোভাকিয়ার সর্বনাশ, স্পেনের সাধারণতন্ত্রের পতন—এ সব হ'লো জহরলালের ব্যক্তিগত বেদনার ব্যাপার এবং তিনি বেদনা ব্যক্ত ক'রলেন পরিষ্কার ভাষায় জগতের সম্মুখে।

কেবল ঘটনা নয়, নীতির বিরুদ্ধেও তিনি নিজের মত পরিষ্কার ভাষায় জগৎকে জানিয়েছেন। এই শতকের তৃতীয় দশক থেকে ইতালী ও জার্মানী যে নীতির প্রচার ক'রে আসছিল তার সঙ্গে জহরলাল যে নীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন তার সঙ্গে কোন মিল নেই—বরং আছে বিষম বিদ্বেষ।

ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা সিনর মুসোলিনীর প্রশংসা পর্যন্ত ক'রলেন—গুণে বা নীতিতে বিশ্বাসী হ'য়ে নয়—ভয়ে।

মিউনিকের পূর্বে জহরলাল বৃটিশ ক্যাবিনেটের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। আলোচনার সময় ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দেরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলের কাছে জহরলাল ফ্যাসীবাদ ও নাজীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত জানান স্পষ্ট ভাষায়। কিন্তু তিনি লক্ষ্য ক'রলেন যে তাঁর মত স্বাগত হ'লোনা। তাঁকে বলা হ'লো যে ঐ দুই মতবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় 'আরও অনেক কিছু' মনে রাখতে হবে!

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সকলকে কারারুদ্ধ করা হ'ল। কংগ্রেস মন্ত্রীদের তার পূর্বেই পদত্যাগ ক'রতে হ'য়েছিল এই জন্য যে তাঁরা ছিলেন ভারতকে ভারতের বিনামুমতিতে যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনার বিরুদ্ধে।

প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের কারাপ্রেরণ করা হ'লো যখন যুদ্ধ চ'লছে গণতন্ত্রের জন্য, আত্‌লান্তিক-সনন্দের ও চতুঃস্বাধীনতার জন্য।

জহরলালের 'ডিস্‌কভারি অফ ইণ্ডিয়ায়' আদর্শ-পূজারীর এই যে ক্ষেদ, এ হ'লো জগতের গণতান্ত্রিক আদর্শের অবহেলা নিয়ে, ত্রুটি নিয়ে অনন্যসাধারণ করুণ রসের কাব্য।

স্বাধীনতা হ'লো মানুষের অন্তরের কামনা! অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হ'য়ে কোন মানুষ বা কোন জাতি সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। পায়ে শিকল থাকলে কেই বা স্বচ্ছন্দে নড়াচড়া ক'রতে পারে? তাই শিকল-ছেঁড়ার গান মানুষ গেয়েছে যুগে যুগে। এই শিকল-ছেঁড়ার ইচ্ছাই ফরাসীদেশে বিপ্লব ঘটিয়েছে; সেখানে এই গানের সুরেই ধ্বনিত হ'য়েছে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী। আমেরিকার যুদ্ধ ও স্বাধীনতালাভ এই ইচ্ছারই বলে। জহরলাল দেখলেন যে এই ইচ্ছা চিরন্তনী; কিন্তু এর ফল সকল সময় মানুষের জীবনকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে না। বিপ্লব ভাঙ্গে কিন্তু সকল সময় গ'ড়তে পারে না; যদিও কিছু গ'ড়ে তোলে তার সঙ্গে জনসাধারণের যোগ অধিকাংশ সময় থাকে না। ঐ যারা অভিজাত, যারা সমাজের মাথায় ওপরে ব'সে আছে, বিপ্লবে সাধারণতঃ হয় তারাই লাভবান। হয়ত ধনিক জমিদারদের ধ্বংস হ'য়ে ক্ষমতা যায় কলের মালিকদের কাছে; ফলে যারা আবহমানকাল নীরবে কাজ ক'রে যায় অথচ তাদের পরিশ্রমফলও তারা পায় না, তারা

থাকে ঠিক সেই স্থানে—বিপ্লবের পূর্বে যেখানে ছিল। ফরাসী-বিপ্লব অভিজাত জমিদারশ্রেণীর উচ্ছেদ ক'রল কিন্তু ক্ষমতা তুলে দিল পুঁজিবাদীদের হাতে। রাজা লুইকে হত্যা ক'রল কিন্তু ডেকে আনল নেপোলিয়নকে। আমেরিকার উপনিবেশ-গুলি স্বাধীনতা লাভ ক'রল, কিন্তু লাভ হ'লো কি? লাভ হ'লো এই যে ব্যবসা গেল ইংরাজ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে উপ-নিবেশের ব্যবসায়ীদের হাতে। যে মেষপালক মেষ চরাত, যে কাঠুরিয়া কাঠ কাঠত তার কোনই লাভ হ'লোনা। তাদের সমানভাবে কাঠ কেটে, মেষ চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ ক'রতে হ'লো। ভারতে স্বাধীনতা-আন্দোলনের তীব্রাবস্থায় জহরলাল জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'হুইদার ইণ্ডিয়া?' ভারত কোন পথে চ'লেছে,—স্বাধীনতা, স্বরাজ, ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাসের পথে?··· তাতে কতটা লাভ হবে? স্বাধীনতার কামনার পরিণতিই কি সব? ঐ যে অগণিত অসহায় মূকের দল, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ওদের পেট যাতে ভরে, মূক থেকে ওরা যাতে মুখর হ'য়ে ওঠে, অসহায়তা যাতে বিদায় গ্রহণ করে তার ব্যবস্থাও স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে ক'রতে হবে। সুতরাং কংগ্রেসের কার্যাবলীর সংখ্যাবৃদ্ধি কর—তার দিগ্বলয়রেখার প্রসার কর।

দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে জগৎ চলেছে সমাজতন্ত্রবাদের অভিমুখে। নীরবনিন্দিত শ্রমিক আর নীরব থাকতে পারে না। প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি সীমাবদ্ধ; সে বাধা দিতে পারে, পথরোধ ক'রতে পারে কিন্তু জীবনধারা

যে নূতন পথ প্রস্তুত ক'রে চ'লেছে তার গতিরোধ ক'রবার ক্ষমতা তার নেই। আজ থেকে দশ বছর পূর্বেও জহরলাল লিখেছিলেন ঃ "সমাজ সমাজতন্ত্রবাদের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। মিঃ গ্রোফ এবং তাঁর মুষ্টিমেয় অনুগামীরা এর ভিতরে আসুন আর নেই আসুন, ঘটনাচক্র এ সন্দেহের অতীত ক'রে তুলেছে যে ক্রমবিবর্তনের গতির বৃদ্ধি যদি না হয় তবে বিপ্লব নিশ্চয় ঘটবে।" যুবনেতা থেকে প্রবীন নেতা জহরলাল এইভাবে বাম ও দক্ষিণ পন্থীদের মিলন ঘটিয়ে আসছেন।

জহরলাল সকলেরই প্রিয়। তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। একজন বৈদেশিক ব'লেছিলেন, "আমি পণ্ডিত নেহেরুকে ভালবাসি।"

প্রশ্ন করা হ'য়েছিল, "কেন ভালবাসেন ?"

ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন, "তাঁকে দেখলেই ভালবাসতে হয়।"

একবার জহরলালকে যখন এক জেল থেকে অন্য জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তখন গভীর রাত্রির অন্ধকার তাঁর ঘরের সামনে, তাঁর বের হবার মুখে একজন ইংরেজ যুবক পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়েছিলেন। জহরলাল বের হ'লে তিনি অন্ধকারেই কতকগুলি বই তাঁর হাতে দিয়ে ব'ললেন, "আমি শুনেছি যে আপনি জার্মান ভাষা শিখতে আরম্ভ ক'রেছেন।" এই কথাগুলো ব'লেই তিনি অন্ধকারে চ'লে গেলেন। আত্মজীবনীতে জহরলাল লিখেছেন যে এই পুলিশ অফিসারের

নাম তিনি জানেন না, তাঁর সঙ্গে আর দেখাও তাঁর হয়নি তবে এই অন্ধকারের বন্ধুর কথা তাঁর আজীবন স্মরণ থাকবে।

কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় যখন মুস্লিম লীগের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসী সভ্যদের সঙ্গে সহায়তা ক'রছিলেন না তখন জহরলাল এক বিবৃতি দেন মুস্লিম লীগের প্রতিনিধিদের ও তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় সরকারে অন্যতম লীগ-প্রতিনিধি সর্দার আব্দার্ রাব্ নিস্তার ঐ বিবৃতির তীব্র সমালোচনা ক'রে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে জহরলালের প্রতি অজস্র দোষারোপ করা হ'য়েছিল এমন কি সর্দার সাহেব তাঁকে ছেলেমানুষ ব'লতেও ত্রুটি করেন নি; কিন্তু সর্দার সাহেব বিবৃতি শেষ করেন এই কথা দিয়েঃ "...এত দোষ সত্ত্বেও পণ্ডিত নেহেরুর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, যা আমরা প্রত্যেকে পছন্দ করি এবং যার প্রশংসা সব সময় করি।"

বল্লভভাই প্যাটেল

"দুন্দুভিতে হ'লো রে কার আঘাত সুরু
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু
পালায় ছুটে সুপ্তি-রাতের স্বপ্নে দেখা মন্দ ভালো ॥"

গান্ধীজি বাজিয়ে চ'লেছেন দুন্দুভি, 'এস, চলে এস, আমার সঙ্গে এস। এস তুমি ব্যবহারাজীব, এস তুমি কেরাণী, শিক্ষক সরকারী কর্মচারী—সকলেই এস। না এলে চ'লবে কি করে? এস, পথের নেশায় মেতে যাও, গৃহে থাকার দিন শেষ হয়েছে। এখন পথকেই করতে হবে অবলম্বন।' ডাকে সাড়া দিলেন আমেদাবাদের বিখ্যাত ব্যবহারাজীব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। ঘটনাতে তাঁর বন্ধুরা, তাঁর পরিচিতেরা যেন আকাশ থেকে প'ড়লেন। এ কি করে সম্ভব? সর্দার প্যাটেল ঐ প্রাক্তন-ব্যারিষ্টার গান্ধীর সত্য ও অহিংস-অসহযোগে বিশ্বাস করলেন? বিশ্বাস ক'রলেন যে এই অস্ত্র দিয়েই প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সাম্রাজ্যকে কাবু করা সম্ভব? পৃথিবী কি উল্টো দিকে ঘুরতে আরম্ভ ক'রেছে? তাঁদের স্মরণ হ'তে লাগল গান্ধীজি সম্বন্ধে সর্দার প্যাটেলের পূর্বমনোভাব।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজি তখন আস্তানা গেড়েছেন আমেদাবাদে। সর্দার প্যাটেল ছিলেন ঐ আমেদাবাদ কোর্টেরই একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার; খ্যাতি

তাঁর উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। আমেদাবাদ ক্লাবে প্রতি সন্ধ্যায় আসতেন বিখ্যাত আইনজীবিরা এবং সেখানে আলোচনা হ'তো নানা রকমের—পাড়ার মেয়ের পলায়ন থেকে আরম্ভ ক'রে রেসের ফাইন্যালিষ্ট ঘোড়ার ফিনিস দেওয়া পর্যন্ত নয়। আলোচনা হ'তো কোর্টের ইংরেজ জজদের অজ্ঞতা থেকে আরম্ভ ক'রে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্দের কথা পর্যন্ত—অর্থাৎ আলোচনার কেন্দ্র ছিল ইংরেজ। এর মধ্যে ঘরোয়া কথা হয়তো দু' চারটে উঠত, কিন্তু তা উঠেই মিলিয়ে যেত। গান্ধীজি আমেদাবাদে আসার পর আলোচনার কেন্দ্র-পরিবর্তন হ'লো—ইংরেজ থেকে অসহযোগ, লর্ড স্যাঙ্কি থেকে সত্য এবং 'মর্লে-মিন্টো' থেকে মোহনদাস করমচাঁদ।

মাত্রাতিরিক্ত নম্র-স্বভাব প্রাক্তন-ব্যারিষ্টার গান্ধী তাঁর সত্য ও অহিংসা-অস্ত্র নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি পরীক্ষা করতে চান—এ অত্যন্ত হাসির কথা। আমেদাবাদ ক্লাবের আইনজীবিরা এই নিয়ে সত্যিই খুব হাসাহাসি করতেন এবং সব চেয়ে বেশী কৌতুক যিনি অনুভব করতেন তিনিই হ'লেন সর্দার প্যাটেল। হাসাহাসি চলাচলির সময় একদিন গান্ধীজি এলেন আমেদাবাদ ক্লাবে তাঁর ধ্যানধারণার কথা বলবার জন্যে। অধিকাংশ আইনজীবি শুনতে গেলেন কিন্তু কয়েকজন গেলেন না। যাঁরা গেলেন না তাঁদের না যাওয়ার নেতৃত্ব করলেন সর্দার প্যাটেল—পরে যিনি গান্ধীজির দক্ষিণ হস্ত বলে পরিচিত হন এবং 'সর্দার অফ বরদলি' এবং 'সর্দার অফ্ ইণ্ডিয়া' আখ্যা

পান। সে দিন গান্ধীজি যখন তাঁর কথা অপর সকলকে শোনাচ্ছিলেন তখন সর্দার প্যাটেল বিদ্রূপের হাসি ঠোঁটে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছিলেন।

বন্ধুরা যখন এই কথা স্মরণ ক'রছিলেন তখন তাঁর বিশেষ পরিচিতেরা স্মরণ ক'রছিলেন তাঁর অতীত জীবনের কথা। সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুতি, মতের পরিবর্তন করা—ইংরেজীতে যাকে 'টারগিভারসেটর' তাই হওয়া, আর যার পক্ষেই সম্ভব হোক না কেন, সর্দার প্যাটেলের পক্ষে একান্ত অসম্ভব! ছাত্রজীবনে শিক্ষকেরা তাঁকে ঘোরাতে পারেননি, তার মনের বিদ্রোহকে দমন ক'রতে পারেন নি; ফলে তাঁকে ছাড়তে হ'য়েছে বিদ্যালয়ের পর বিদ্যালয়। নিজেকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে খাপ খাওয়ানর চেষ্টার চেয়ে, খাপ না খেলে সোজা বিদ্যালয়-পরিবর্তন করাই উচিত—এই ছিল প্যাটেলের মনোভাব।

লেখাপড়া শেষ হ'লো। সর্দার প্যাটেল আইন-ব্যবসা ক'রতে সুরু ক'রলেন। দেওয়ানী আইনের কুচ্‌কচালি তাঁকে ঠাণ্ডা ক'রে দিত। দেওয়ানী আইনেতে মজার কি আছে? দু' কাঠা জমি বা দু' হাজার টাকা কে পাবে—কার পাওয়া উচিত?—এই নিয়ে বই এর পর বই ওলটান, সওয়াল জবাব করা ইত্যাদিতে কোন আনন্দ নেই সর্দার প্যাটেলের কাছে! তাই তিনি দেওয়ানীকে সেলাম ঠুকে পূর্ণভাবে বন্ধুত্ব ক'রলেন ফৌজদারীর সঙ্গে। খুন, ডাকাতি, লুঠতরাজের মামলায় আসামীর পক্ষ হ'য়ে দাঁড়ানতে একটা আনন্দ আছে। এবং

সর্দার প্যাটেলের আইনজ্ঞতার পূর্ণপ্রকাশ হ'তে লাগল ঐ সমস্ত মামলায়। তিনি হ'য়ে উঠলেন বিচারকদের ভীতির কারণ; এবং শোনা যায় যে তাঁকে এড়াবার জন্যে অনেক ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেদের বিচারালয়ের স্থান পরিবর্তন ক'রে-ছিলেন,—প্যাটেলকে বিচারালয় পরিবর্তন করাতে পারেননি।

আইন-ব্যবসাতে টাকা জমিয়ে তিনি সমুদ্র পাড়ি দিলেন, ব্যারিষ্টার হবার জন্যে। ইংলণ্ডে এসে তিনি চরিত্রগত একাগ্রতা নিয়ে আইন-অধ্যয়নে মেতে গেলেন। ব্যারিষ্টার হ'তে এসেছেন এখানে তিনি। ব্যারিষ্টার হওয়াই হ'লো ইংলণ্ডে আসার প্রথম ও শেষ কথা। বেড়ান, দেশ দেখা, ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়া—এ সবের জন্যে তিনি ত' আসেন নি। তাই শুধুই আইন অধ্যয়ন। এই একাগ্রতার বলে তাঁর পক্ষে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম হওয়া বিশেষ শক্ত' হলোনা। ব্যারিষ্টারি পাশ করে, ইংলণ্ড ভাল ক'রে না দেখেই—ইউরোপের অন্য কোন দেশ ভ্রমণ না, ক'রেই তিনি সোজা ভারতগামী জাহাজ চ'ড়ে ব'সলেন। ব্যারিষ্টার হ'তে এসেছিলেন, ব্যারিষ্টার হ'য়েছেন। তিনি ত' আর য়ুরোপ ভ্রমণের জন্যে আসেননি; সুতরাং সোজা ফিরতে হবে। কোনরকম কৌতূহল বা অভিজাতমূলক বিলাস যে প্যাটেলের ধাতে সয়না সেই প্যাটেল পড়'লেন গান্ধীর আওতায়!

হ্যাঃ প্যাটেল প'ড়লেন গান্ধীজিরই আওতায়—গান্ধী-বাদের আওতায় নয়। গান্ধীজির অনেক তত্ত্বে প্যাটেল তখন

বিশ্বাস করেননি, আজও করেন না; তবুও তাঁর ওপর গান্ধীজির প্রভাব হ'লো অপরিসীম।

গুজরাট ছিল ভারতের রাষ্ট্রনীতি-আন্দোলনে পিছনের স্থান অধিকার ক'রে। গুজরাটীদের পথের নেশায় গান্ধীজি এমন ভাবে মাতালেন যে সর্দার প্যাটেল হ'য়ে গেলেন হতবাক। তিনি আবিষ্কার ক'রলেন যে ঐ শীর্ণদেহ সন্ন্যাসীর মধ্যে কি এক শক্তি নিহিত আছে। প্যাটেল নিজে হ'লেন একজন 'ষ্ট্রং ম্যান' তাই গান্ধীজির অসামান্য আত্মবিশ্বাস তাঁর মনে তোলে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন, এবং গান্ধীজি যখন কার্য-প্রণালীর নির্ধারণ করলেন যে কার্যপ্রণালীর মধ্যে সংগ্রামশীতলার অভাব নেই—তখন একদা গান্ধী-উপেক্ষাকারী সর্দার প্যাটেল এসে তাঁর পায়ের তলায় ব'সলেন। এবং সেই থেকে গান্ধীজির জীবনকালে গান্ধীজির দেওয়া নির্দেশকে অপূর্বরূপে কাজে লাগিয়েছেন নিজের অসাধারণ একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও কর্মশক্তি বলে।

এই একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও কর্মশক্তি সর্দার প্যাটেলের হাত দেওয়া কাজকে সফল ক'রে তুলবার পথে হয়েছে একমাত্র সহায়ক। আমেদাবাদে আইন-ব্যবসায়ে বিপুল অর্থোপার্জন থেকে দেশীয় রাজ্যগুলিতে আমূল পরিবর্তন অবধি হ'লো ঐ ত্রিগুণেরই ফল।

বরদলি প্রথম চেনালে সর্দার প্যাটেলকে ভারতের কাছে, কিন্তু এমনভাবে চেনালে যে সে চেনা কখনও ভোলবার নয়।

ভারতবর্ষ এই বরদলিতেই প্রথম নিদর্শন পায় সর্দার প্যাটেলের সংগঠনশক্তির। গ্রাম থেকে গ্রাম তিনি ঘুরেছেন তাঁর গুরুর বাণী নিয়ে, গ'ড়েছেন কৃষকদল এবং তারপর এই কৃষকদল নিয়ে নেমেছেন কর-বিরোধী আন্দোলনে, বরদলিতে।

সমগ্র দেশ অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখল যে ঐতিহ্য-পরম্পরা-ক্রমে ভীরু ও মূক, অপ্রতিরোধকারী কৃষকেরা পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সরকারের নিষ্পেষণ তুচ্ছ ক'রে আজ দলে দলে এগিয়ে যাচ্ছে 'কর-বিরোধী আন্দোলনে' সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে। আন্দোলন যখন ফলপ্রসূ হ'লো তখন শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্চারিত সর্দার প্যাটেলের নাম ভারতের এক কোন থেকে অপর কোন পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে।

আইন-অমান্য আন্দোলনে সর্দার প্যাটেল আর এক ধাপ উঠে এলেন। আন্দোলনে তিনি এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রলেন যে শত শত সরকারী কর্মচারী সরকারের কাজে ইস্তফা দিলেন। বৃটিশ-শাসনের যুগে এরকম ঘটনা পূর্বে আর ভারতে ঘটেনি।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যখন আইন পরিষদে ঢোকা মনস্থ ক'রলে এবং গান্ধীজি অনুমতি দিলেন তখন সর্দার প্যাটেল তাঁর কর্ম ও সংগঠন শক্তি নিয়োজিত ক'রলেন এই কাজে। ১৯৩০ সালে ঐ দুই শক্তি তিনি নিয়োজিত ক'রেছিলেন গভর্ণমেণ্ট থেকে কংগ্রেস-নীতি বিশ্বাসীদের সরিয়ে আনবার

জন্যে ; আর ১৯৩৭ সালে নিয়োজিত ক'রলেন গভর্ণমেণ্টে ঢোকাবার জন্যে।

আইন পরিষদে ঢোকবার পর আটটি প্রদেশের শাসনভার কংগ্রেস যখন গ্রহণ ক'রলে তখন এই আটটি কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশকে সর্দার প্যাটেল চালাতে লাগলেন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি কমিটির সভাপতি-হিসাবে। এত দৃঢ়হস্তে তিনি প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার লাগাম ধ'রেছিলেন যে প্রধান মন্ত্রীরাও তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রতেন ভয়ে ভয়ে। এই পার্লামেণ্টারি কমিটির সঙ্গে মতের অমিলের জন্যে মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ এন, বি, খারেকে বিদায় নিতে হ'য়েছিল কোন প্রতিবাদ না ক'রে।

পার্লামেণ্টারি সাব-কমিটি এই আটটি প্রদেশে বাইরে থেকেও শাসন-ব্যবস্থা এমনভাবে চালাছিলেন যে কংগ্রেস-মন্ত্রীদল সব যায়গাতেই দল হিসাবে কাজ ক'রছিলেন। এমন সময় মধ্যপ্রদেশে দল ভাঙ্গবার উপক্রম হ'লো। মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খারের দুই বন্ধু মন্ত্রী তাঁর হাতে তাঁদের পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। ডাঃ খারে তখন পার্লামেণ্টারি কমিটিকে কিছু না জানিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রীত্রয়ের কাছে পত্র লিখে জেনে পাঠান যে তাঁরা, নিয়মতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির নিয়ম অনুসারে, প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পদত্যাগ ক'রবেন কিনা ? মন্ত্রীত্রয় স্পষ্টই জানান যে কংগ্রেসের প্রতি তাঁদের যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বের জন্যেই নিয়মতন্ত্রের ঐ

নিয়মটি মানা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। দু'জন মন্ত্রী চিঠিতে এই রকম লিখেছিলেন, "আপনার পক্ষে আপনার সহকর্মীদের কাছ থেকে এইরকম প্রতিশ্রুতি চাওয়া অপরাধ যে আপনি যদি কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করেন তা'হলে তাদের অগ্রাহ্যতা স্বতশ্চলের মত' আপনাকেই গ'ড়ে উঠবে। সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়মানুবর্তিতার নামে আমাদের যে দিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারেন, কিন্তু কোন্ বিদ্রোহীর পক্ষে আমাদের কাছ থেকে ঐ রকম ব্যবহার আশা করা অন্যায়।"

তারপর ডাঃ খারে মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর স্যার ফ্রান্সিস্ ওয়াইলির সহযোগিতায় এই মন্ত্রীত্রয়কে বিতাড়িত ক'রে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ডাঃ খারের এই মন্ত্রীসভাই হ'লো পৃথিবীর ইতিহাস সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী মন্ত্রীসভা কারণ নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের পনের ঘন্টা পরেই ডাঃ খারেকে পার্লামেণ্টারি কমিটির নির্দেশে গভর্ণরের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠাতে হ'লো। পত্রে লেখা ছিল যে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের পর ডাঃ খারের সঙ্গে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ও পার্লামেণ্টারি সাব কমিটির আলোচনা হ'য়েছে। আলোচনার ফলে ডাঃ খারে বুঝতে পেরেছেন যে "অবস্থার বিচার বিষয়ে তিনি মহাভুল ক'রেছেন।"

ডাঃ খারে গেলেন এবং নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হ'লো ঐ বিরোধী মন্ত্রীত্রয়ের একজন, পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লার নেতৃত্বে। এই ঘটনায় ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক পণ্ডিতেরা এবং এদেশের

উদারনৈতিকেরা কংগ্রেসের, বিশেষ করে পার্লামেণ্টারি কমিটির সভাপতি সর্দার প্যাটেলের নিন্দা কর'লেন প্রাণ ভ'রে।

ডাঃ জেনিংস্ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতামত উল্লেখ ক'রে এঁরা জানালেন যে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধের একমাত্র ফল হ'লো বিরোধী মন্ত্রীর বিদায় গ্রহণ—প্রধান মন্ত্রীর নয়। এবং পার্লামেণ্টারি সাব-কমিটির পক্ষে এইরকম ব্যাপারে হাত দেওয়া নিয়মতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত ক'রেছে। লণ্ডনের নিউজ রিভিউ লিখলে "গত সপ্তাহে ক্রম্ ওয়েল্ডার প্যাটেল সুদূর হোয়াইট্ হলের ইণ্ডিয়া অফিসের বারাণ্ডা পর্যন্ত ধূলা উড়িয়েছেন।......অবাধ্য ডাঃ খারেক তাড়িয়ে দিয়েছেন।··· একজন অবাধ্য অফিসের ছোকরাকে তাড়াতে যে রকম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়, ডাঃ খারেকে তাড়াতে তার বেশীর প্রয়োজন হয়নি···।"

নিয়মতন্ত্রের দোহাই পাড় বা আর যাইই কর সর্দার প্যাটেল যখন ষ্টীম্ রোলার চালিয়েছেন তখন সামনে এসে যে কেউ বাধা দেবে তাকেই তলায় পড়তে হবে চাপা—ষ্টীম্ রোলার থামবেও না, বেঁকেও চলবে না। এই ষ্টীম্ রোলার সেদিন চালিয়েছিলেন পার্লামেণ্টারি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে, আজ চালাচ্ছেন ভারত-সরকারের মন্ত্রী হিসাবে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর।

দর্শনে তাঁর গান্ধীজির মতবাদ কতকটা ঢুকলেও তিনি

মোটেই গান্ধীজির কার্বন-কপি নন—এমনকি গান্ধীজির ভাব-ধারণার আধ্যাত্মিক দিকটা বল্লভভাইকে কখনও আকর্ষণ ক'রতে পারেনি। হ'য়তো শুনে অনেকে অবাক হবেন যে 'গান্ধীজির দক্ষিণ হস্ত' সেদিন পর্যন্ত গান্ধী-গীতা দক্ষিণ হস্তে নিয়ে উল্টে পাল্টেও দেখেন নি। কর্মপদ্ধতিকে ও আদর্শবাদকে প্যাটেল তাঁর অভিজ্ঞতার ওপর খাড়া ক'রেছেন। তিনি হ'লেন ভূয়োদর্শনবাদী বা দৃষ্টিবাদী। এ হ'য়েছে, ও হয়নি—ব্যাস্! যা হয়নি বা যা হওয়া অসম্ভাব্যের সীমানায় পড়ে, বল্লভভাই তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। বেশী দূরের বস্তুর প্রতি তাঁর লক্ষ্য বিশেষ নেই। নগদ যা পাওয়া সম্ভব তার জন্যে তিনি কঠিন পরিশ্রম ক'রতে প্রস্তুত কিন্তু প্রতিশ্রুতির পিছনে ছোটবার আগ্রহ তার নেই; পোষ্ট-ডেটেড্ চেক নিয়ে পকেট ভারী ক'রতে তিনি সম্পূর্ণ অরাজী। তাই অহিংসামন্ত্রে জনসাধারণকে দীক্ষিত করার চেষ্টায় কালক্ষেপ করার চেয়ে এখনই জনসাধারণের সহযোগে অসহযোগ করা যাক! অসহযোগাভ্যাস ক'রতে ক'রতেই তারা অহিংস হ'য়ে উঠবে। রামরাজ্য গড়ার চেষ্টার চেয়ে দেশীয় রাজ্যগুলি গড়া যায় কিনা দেখা যাক!

আদর্শবাদের বাধা মানতে তিনি প্রস্তুত নন কারণ তাঁর নীতি হ'লো কর্মবাদ। কি ক'রে উদ্দেশ্য সফল ক'রতে হয় তা তিনি ভাল ক'রেই জানেন। উদ্দেশ্য সফলের পথে হয় তাঁকে মেনে নিতে হবে, না হয় তাঁর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে

হবে। গান্ধীজির সমাজ-দর্শনের খদ্দরের প্রচার, অস্পৃশ্যতা দূর করা, মাদকদ্রব্য-বর্জন প্রভৃতি ব্যাপার কখনও বল্লভ-ভাইএর মনকে নাড়া দেয়নি। আর সকলে ঐ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাক, তাঁর মাথা নিয়োজিত থাকবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে। গান্ধীজি নির্দেশ দিয়েছেন আর সর্দার প্যাটেল চ'লেছেন সেই নির্দেশ অনুসারে—শত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে। পণ্ডিত মতিলাল ও দেশবন্ধুর স্বরাজ দলের আইন পরিষদে ঢোকার সপক্ষে গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে তিনি এমনভাবে সংগ্রাম ক'রেছিলেন যে তাঁর কর্মশক্তি দেখে সমগ্র ভারত হ'য়ে গিয়েছিল হতবাক। এই সংগ্রামে প্রতি-পক্ষে দলে ছিলেন তাঁর দাদা বিট্‌লভাই প্যাটেল।

সংগ্রামে তাঁর আসক্তি ও আগ্রহ অতুলনীয়। যদি পরি-বেশের একটুখানি তফাং হ'তো তবে হ'য়তো তিনি অস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে সৈন্যচালনা ক'রতেন। কিন্তু যে পরিবেশে তিনি জন্মেছিলেন সে পরিবেশে তা করা সম্ভব ছিলনা—তাই যুদ্ধ হ'লো রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধ। তাঁর এই সংগ্রামশক্তি হ'লো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। গুজরাটের কাহিরা জেলায় তাঁর আদি নিবাস ; এই কাহিরা জেলা ইংলণ্ডের শেরউড্ বনের মত রবিনহুড্ ঐতিহ্যময়। সিপাহি-বিদ্রোহ আরম্ভ হ'লে সর্দার প্যাটেলের পিতা তলোয়ার নিয়ে, ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়ে প'ড়লেন ইংরেজদের সঙ্গে লড়বার জন্যে। সর্দার প্যাটেলও বেরিয়েছেন অনেকবার, তবে হাতে অস্ত্র ছিল না।

অস্ত্রবিহীন মুষ্টিবদ্ধ হাতে তিনি বারবার প্রতিপক্ষকে জানিয়েছেন যে 'বলপ্রয়োগের দ্বারা বলপ্রয়োগ বন্ধ করা হবে।'

চরিত্রের কাঠিন্যে তিনি বোধ করি গান্ধীজিকেও ছাড়িয়ে গেছেন। দেহে ও পোষাকে এমন একটা রুক্ষ সরলতা আছে যে দেখে ভয় হয়। এই রুক্ষতার অন্তরালে কি আছে তা বাহির থেকে বোঝবার কোন উপায়ই নেই। শত বিপদেও তাঁর মুখাকৃতির পরিবর্তন হয় না, দেহে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটেনা। গান্ধিজী ব'লে গেছেন যে 'মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া দুর্বল চরিত্রের লক্ষণ'; কিন্তু বোধকরি নিজে সম্পূর্ণভাবে এই দুর্বলতাকে জয় ক'রতে পারেন নি। জয় করেছেন সর্দার প্যাটেল। ফোটোতে কস্তুরাবাইএর প্রজ্বলিত চিতার সম্মুখে গান্ধীজিকে যখন দেখি তখন মনে হয় যেন তিনি অল্প শোকাভিভূত। অধ্যাপক আবদুল বারির মৃত্যু-সংবাদ যখন তাঁকে জানানো হয় তখন, সংবাদপত্রে প্রকাশ, তিনি মিনিট পাঁচেক কোন কথা ব'লতে পারেন নি। প্যাটেল কিন্তু ক'রে দিয়েছেন অবাক!

অনেকদিন আগে সর্দার প্যাটেল একবার আমেদাবাদের কোর্টে দাঁড়িয়ে সওয়াল ক'রছিলেন এমন সময় তাঁর হাতে একখানি টেলিগ্রাম দেওয়া হয়। তিনি টেলিগ্রামখানি খুলে পাঠ ক'রে পকেটে রেখে দিয়ে পূর্বের মতই সওয়াল করতে লাগলেন। কেউ জানতেও পারলে না যে কিসের টেলিগ্রাম। সওয়াল শেষ হ'য়ে গেলেও টেলিগ্রামের খবর গুপ্ত রইল।

কোর্ট যখন সেদিনকার মত বন্ধ হ'লো তখন সকলে জানতে পারলে যে ঐ টেলিগ্রাম তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ বহন ক'রে এনেছে। এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই ক'রে তোলে ভীত তাঁর প্রতিপক্ষকে—এমন কি তাঁর স্বজন ও সহকর্মীকে।

রুক্ষ সরলতাই তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে অর্থের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, কিন্তু তাঁকে ঘিরে থাকে অর্থবান ও পুঁজিবাদীর দল। এতে অনেক সময় কি একরকম সামঞ্জস্যের অভাব ঠেকে! হজরৎ মহম্মদ যদি সন্দেশ খেতে যেতে উপদেশ-প্রার্থী বালককে সন্দেশ ছাড়তে উপদেশ দিতেন এই রকমই সামঞ্জস্যের অভাব ঠেকত। সর্দার প্যাটেলের ব্যাপারে একটু তলাতে পারলে কিন্তু আর সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবে না।

প্যাটেল বিশ্বাস করেন যে ঐ পুঁজিবাদীদের সাহচর্য বিরক্তজনক ও ক্ষতিকারক কিন্তু এর চেয়ে বেশী বিশ্বাস করেন যে কংগ্রেসের বাইরে এই পুঁজিবাদীর দল থাকলে এর চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতির কারণ হবে। অর্থই হ'লো ক্ষমতায় পৌঁছুবার পাকা সড়ক। এই পাকা সড়কের জন্য খরচ হয় বটে, কিন্তু যাত্রা হয় সুগম। ড্র'মনি বোঝা কাঁধে নিয়ে অলি-গলি দিয়ে অনেক কষ্টে পৌঁছোনোর চেয়ে এই পাকা সড়কের খরচ বহন করতে তিনি প্রস্তুত। এই বিষয়ে তিনি জিন্নার প্রতিলিপি এবং দু'জনেই মেকিয়াভেল্লির কাছাকাছি গিয়ে প'ড়েছেন। পর্বতচূড়ায় যদি ওঠাই যায়, কি করে উঠলুম খোঁকে মনে রাখবে না।—এই হ'লো দু'জনেরই মনোভাব।

মেকিয়াভেল্লির এই নীতিকে নীতিবাদীরা ঘৃণা করেন সত্যি কিন্তু বারবার এ কথা প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে সফলতায় পৌঁছোবার পক্ষে এ হ'লো প্রশস্ততম সোপান। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি 'সাম্প্রতিক যুগে মেকিয়াভেল্লি কতটা সচল' ব'লে আলোচনা ক'রে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি এই মত পোষণ ক'রেছেন যে মেকিয়াভেল্লির রাষ্ট্রনীতি ষোল শতকের ইতালীর পক্ষেই প্রযোজ্য। তিনি প্রবন্ধটা যদি আরও কিছুদিন পরে অর্থাৎ আণবিক বোমার পরে লিখতেন, তা হ'লে বোধকরি এরকম উক্তি ক'রতেন না। আণবিক বোমা ফেলে আমেরিকা যুদ্ধ থামাতে চেয়েছিল। এর অর্থ হ'লো যে যুদ্ধ যদি থামে তবে লোকে আণবিক বোমার কথা ভুলে যাবে অর্থাৎ গন্তব্যস্থানই আসল তা সে যে পথ দিয়েই যাও না কেন। আমেরিকাও মেকিয়াভেল্লিকে পূজা ক'রলে!

জনগণের সঙ্গে প্যাটেলের সম্পর্ক খুবই কম। তৃতীয় নেপোলিয়নের মত গণতন্ত্রকে তিনি 'রুল বাই দি ক্যাট্‌ল্, ফর দি ক্যাট্‌ল্ এবং অফ্ দি ক্যাট্‌ল্' না ব'ললেও জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা মোটেই নেই। এই মনোভাব গান্ধীজির সংস্পর্শে অনেকটা পরিবর্তিত হ'য়েছে কিন্তু কখনও জনমতের সঙ্গে তাঁর নিজের মতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। স্পষ্ট, পরিষ্কার সামাজিক দর্শন বল্লভভাই জ্ঞাননেত্রে কখনও দেখেননি, তাই 'দ্রষ্টাও' তিনি নন।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননায়ক তিনি। তাঁর কাজ হ'লো উপনিবেশ স্থাপকের, পথ প্রদর্শকের নয়। পথ দেখিয়েছেন গান্ধীজি আর পথ পরিষ্কার ক'রেছেন সর্দার প্যাটেল; গান্ধীজি ক'রেছেন কলম্বসের কাজ আর লোক লস্কর নিয়ে তাঁবু গেড়ে উপনিবেশ স্থাপন ক'রেছেন সর্দার প্যাটেল। আবিষ্কার ক'রলেই হ'লো—জঙ্গল কাটিয়ে বসবাসের উপযোগী ক'রবার ভার প'ড়েছে সর্দার প্যাটেলের ওপর।

মৌলানা আজাদ

ভারতে আসবার নূতন পথ খুঁজতে বেরিয়েছেন জেনোয়ানিবাসী কলম্বস্। তাঁর ধারণা পৃথিবী গোল এবং এই পথ দিয়ে গেলেই নিশ্চয় ভারতে পৌঁছোনো যাবে। স্পেনের রাণী ইজাবেলার সাহায্য পেয়ে কয়েকখানি জাহাজ ও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীদের সঙ্গী ক'রে তিনি অজানা সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়েছেন। য়ুরোপ থেকে ভারতে আসবার পথ বের ক'রতেই হবে! পথে ঘটল অশেষ বিপদ এবং রাণী ইজাবেলার দেওয়া জাহাজের হ'লো 'পাল ছেঁড়া, হাল ভাঙা' অবস্থা। সঙ্গীদের ধারণা পৃথিবী গোল নয়, পৃথিবী চৌকো; সুতরাং একটা সীমানার বাইরে গেলেই অতলে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা। ঐ অতলতা হ'লো শয়তানের দেশ। তীর যখন আর পাওয়া যায় না তখন জাহাজের লোকেরা মরীচিকা দেখতে সুরু ক'রলো: "ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন! ঐ দেখ উপকূল দেখা যাচ্ছে, ঐ দেখ তরুশ্রেণী।"

হন্তদন্ত হ'য়ে কলম্বস্ ছুটে আসেন এবং দেখেন:

"কোথা তীর! চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে।"

হতাশার হাসি হেসে কলম্বস বলেন, "ও তীর নয়, ও মরীচিকা। দেখলে না আপনা থেকেই মিলিয়ে গেল?"

"মরীচিকা!" সঙ্গীরা ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, "ক্যাপ্টেন, এখনো জাহাজ ফেরাও, ফিরে চল—এ হ'লো শয়তানের দেশ।"

ফেরা? না, কলম্বসের পক্ষে তীর না দেখে ফেরা সম্ভব নয়। সঙ্গীরা উন্মাদ হবার উপক্রম। অবশেষে তারা ঠিক ক'রলে যে কলম্বসকে হত্যা ক'রেই জাহাজ ফেরাতে হবে।

হত্যার প্রয়োজন আর হ'লোনা। তীরের দেখা কলম্বস্ পেলেন। ভারতে আসবার পথ তিনি আবিষ্কার ক'রতে পারেন নি সত্যি, কিন্তু পৃথিবীতে দিয়ে গেছেন এক বিস্মৃত জগতের সন্ধান।

* * * *

১৯২০ সালে পূরো চার বছর অন্তরীণের পর মৌলানা আজাদ ছাড়া পেলেন। তাঁকে অন্তরীণ ক'রে রাখা হ'য়েছিল কারণ তিনি দিয়েছিলেন মুসলমানদের নূতন পথের সন্ধান এবং চেষ্টা ক'রছিলেন সেই পথ দিয়ে নিয়ে যাবার। ছাড়া পেয়েই তিনি খিলাফৎ ও অসহযোগ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে প'ড়লেন এবং জাতীয়তাবাদকে ক'রে নিলেন একান্তভাবে বরণ। এই জাতীয়তাবাদের পথে এসেছে শত লক্ষ ঝঞ্ঝা, বাধা, বিপত্তি; কিন্তু মৌলানা আজাদ চ'লেছেন সম্মুখ দিকে। চলার পথে কত সহকর্মী তাঁকে ছেড়ে চ'লে গেছেন, কত সহকর্মী তাঁকে

বুঝিয়েছেন, "মৌলানা! ভারতের জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের জন্যে নয়।"

মৌলানা জবাব দিয়েছেন, "তাও কি হয়? এই ত' হ'লো মুসলমানদের মুক্তির পথ।"

ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সারা ভারতে বাঁধল দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ এর আগে কখনও এত বেদনাদায়ক হয়নি। মৌলানার সহকর্মীরা ডাকলেন, "মৌলানা সাহেব, এখনও ফেরো। তোমার দিব্যদৃষ্টির স্বর্ণরাষ্ট্র কখনও আসবে না।"

মৌলানা ব'ললেন, "ফেরা অসম্ভব। তীর না দেখে আমি কি ফিরতে পারি?" সহকর্মীরা ব'ললেন, "তা' হ'লে তুমি থাক, আমরা চললুম।"

মৌলানা ব'ললেন, "তোমরা যদি না আস তবে আমাকে একলাই চলতে হবে!"

মুষ্টিমেয় সহকর্মী নিয়ে মৌলানা আজাদ চ'ললেন এবং চলার পথের শেষেও এসে আজ পৌঁছেছেন। অখণ্ডিত ভারতে স্বাধীনতার সূর্যের নবরূপ চোখ ভ'রে দেখা অবশ্য সম্ভব হ'লোনা! স্বাধীনতার আলোকসম্পাত হ'লো খণ্ডিত ভারতে। এবার নূতন যাত্রার পালা। ভবিষ্যকাল বিচার ক'রবে যে মৌলানা আজাদ আজকের ভারতের চার কোটি মুসলমানকে ঠিক পথে চালাতে পেরেছেন কিনা? ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ভারতে তারা তাদের ন্যায়তঃ অধিকার বুঝে নিতে পেরেছে কি না মৌলানার নেতৃত্বে?

যদিও অখণ্ডিত ভারতে হিন্দু ও মুসলমানকে সুখ-দুঃখে একই সূত্রে গাঁথা আজাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি তবুও আশাবাদীর আশা যে খণ্ডিত ভারতে তিনি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নূতন ভাবের সৃষ্টি ক'রবেন যে ভাব জগৎকে দেবে এক নূতন আলো। জগতের পক্ষে সে আলোর মূল্য কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে কম নয়।

* * * *

মৌলানা আজাদের জন্ম হ'লো মক্কায়—মুসলমানদের ধর্ম-গুরু হজরৎ মহম্মদের জন্মভূমিতে; শিক্ষা, অধুনা পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রোর আল্ আজ্‌হার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে; কর্মস্থান, পৃথিবীর অধিকসংখ্যক মুসলমানের বাসস্থান, ভারতে। শিক্ষায় তিনি ছেলেবেলাতেই অনেক বুড়োকে তাক লাগিয়েছেন। ষোল পেরোবার আগেই তিনি মুসলমানদের ধর্মতত্ব ও নীতিশাস্ত্রে এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন যে ইস্‌লাম জগতের পণ্ডিতেরা হ'য়ে যান অবাক। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে জন্ স্টুয়ার্ট মিলের তুলনা করা চলে। ষোল পেরোবার আগেই মিল বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হ'য়ে উঠেছিলেন; কিন্তু অত্যধিক শিক্ষা মিলের প্রতিভাকে নষ্ট ক'রে দেয়। মৌলানা আজাদের বেলায় কিন্তু ঠিক উলটো ব্যাপার ঘটেছিল। শিক্ষা তাঁর প্রতিভাকে আরও উজ্জ্বলতর ক'রে তোলে এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রকাশ থেকে এটুকু বোঝা যায় না যে সেটা প্রতিভার দান না পরিশ্রমের ফল।

প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের মত হ'লো যে শিক্ষা মানুষের প্রকৃতি-প্রদত্ত গুণাবলীকে উজ্জ্বলতর ক'রে তোলে মাত্র। মৌলানা আজাদের পাণ্ডিত্য এ বিষয়ে জাজ্বল্যতম প্রমাণ।

আজাদের জ্ঞানগর্ভ রচনা তাঁর বাল্যেই ইস্‌লাম জগতে এক অপূর্ব আলোড়ন তোলে। বয়স তাঁর মোটে আঠার, এমন সময় নিমন্ত্রণ এল লাহোরের এক জ্ঞানীদের সভায় দর্শনের এক দুরূহ বিষয়ে বক্তৃতা করবার জন্যে। সভার ব্যবস্থাপকেরা মৌলানা আজাদকে চিনতেন না। আজাদ যখন এসে হাজির হ'লেন তখন তাঁরা অবাক হ'য়ে গেলেন। জ্ঞানীদের সভা, দুরূহ তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা—তাঁর একজন দীর্ঘশ্মশ্রু, গম্ভীর, সৌম্য বৃদ্ধকেই বক্তারূপে দেখবার আশা ক'রেছিলেন। সুতরাং তার স্থলে এক আঠার বছরের অপরিণত কিশোরকে দেখে যে আশ্চর্য হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? প্রথমে তাঁরা মনে ক'রলেন যে তাঁদের নিমন্ত্রিত বক্তার পুত্র এসে হাজির হ'য়েছেন। পরে জানলেন পুত্র নন, তিনিই মৌলানা আজাদ। মন তাঁদের খারাপ হ'য়ে গেল। এক বালকের কাছ থেকে দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে হবে? নিমন্ত্রণ যখন করা হ'য়েছে তখন এ ছাড়া আর উপায় কি? বক্তৃতার শেষে তাঁদের বিস্ময় আর রইল না; তাঁরা হ'য়ে গেলেন হতবুদ্ধি। তা' হ'লে আঠার অনেক সময় আটাশির কান মলতে পারে!

আঠার বছর কিছু কম বয়স নয়! এই বয়স পেরোবার আগেই অনেকে অনেক বড় বড় কাজ ক'রেছেন। বাবর এই

আঠারর আগেই নিজের ভাগ্য চালিয়েছেন, আকবর হিমুর অভিভাবকত্ব ছিন্ন ক'রেছেন, জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ বহুশাস্ত্রজ্ঞ হ'য়েছেন, শ্রীচৈতন্ত ন্যায় ও স্মৃতি গুলে খেয়েছেন—ইত্যাদি। 'আঠার বছরের কাহিনী' ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

মৌলানা সাহেবের পিতা সিপাহি-বিদ্রোহের পর ভারত ছেড়ে চ'লে যান। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং মুসলমানদের একজন বিখ্যাত ধর্মনেতা। ভারত ছেড়ে তিনি ইরাক, ইরাণ, তুরস্ক, প্যালেষ্টাইন, মিশর প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়ান এবং এই সমস্ত দেশে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ও ধর্মাসক্তির বলে অসংখ্য মুসলমানকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করান। মারা যান তিনি কিন্তু ভারতেই এবং মারা যাবার সময় আশা ক'রেছিলেন যে তাঁর পুত্র আগা খাঁর মত এক বিখ্যাত সম্প্রদায়ের নেতা হবেন। মালমশলা তিনিই জোগাড় ক'রে দিয়ে গেছেন, নেতৃত্বের লাগামটি শুধু হাতে নিলেই হবে!

মৌলানা আজাদ কিন্তু লাগাম ছুড়ে ফেলে দিয়ে রথকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন নূতন প্রভাতের দিকে। মুসলমানদের কুসংস্কারের ভাবে পূর্ণ চিরাচরিত পথ দিয়ে নিয়ে গেলে আর চ'লবে না—নবযুগের সাহিত্য ও বিজ্ঞান একথা তাঁকে ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছিল। তাদের দিতে হবে নূতন আলোর সন্ধান! এই উদ্দেশ্যে তিনি এক উর্দু পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ক'রলেন। এই পত্রিকাটিই হ'লো বিশ্ববিখ্যাত 'আল্ হিলাল্'।

আজাদ হ'লো মৌলানা সাহেবের ছদ্ম নাম। 'আজাদ'

কথার অর্থ মুক্তি। মুসলমানদের মুক্তি-পথের সন্ধান দেবার জন্যে তিনি এই ছদ্মনামেই আল্ হিলাল্ সম্পাদনা ক'রতে লাগলেন। যেমন আশা করা গিয়েছিল, পত্রিকাটি মুসলমান সমাজে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রল। এবং ক্রমে ক্রমে হ'য়ে দাঁড়াল ইস্‌লাম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্কের একটি কেন্দ্র। সংবাদিক-তায় আল্ হিলাল্ যেন এক নবযুগের সৃষ্টি ক'রল! গোঁড়া যাঁরা তাঁরা আল্ হিলালের নূতন সুরে চ'মকে উঠলেন। ঐতিহ্যের ভিত্ ধ'রে এভাবে নাড়া দেওয়া কি ভাল? আজাদের কাছে চিঠি এল: তোমার কাছে প্রাণ বড় না আল্ হিলাল্ বড়? ...যদি প্রাণ চাও তবে আল্ হিলাল্ বন্ধ কর। যদি বন্ধ না কর তবে প্রাণটা আগে যাবে পরে আল্ হিলাল্ আপনা থেকেই বন্ধ হবে। আল্ হিলাল্ বন্ধ হ'লোনা—চ'লল। এবং যা ক'রতে চেয়েছিল তা ক'রল।

মুসলমানেরা রাষ্ট্রনীতি থেকে দূরে স'রে বিদেশী সরকারের কোলে ব'সে দুধ-ক্ষীর ননী খাবার আশা ক'রছিল। এবং কোলে ব'সে দুধ-ক্ষীর-ননী খেতে হ'লে যে রকম আধো আধো কথা ব'লতে হয় সেই রকম কথাই ব'লছিল। আল্ হিলাল্ তাদের আধো-আধো বাধো-বাধো কথা ছাড়াল এবং রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে এমন কথা বলাতে আরম্ভ করল যা বুড়ো ছেলের খোকামির মত বুঝতে আর কষ্ট হ'লোনা।

বৃটিশ সরকার ব্যতিব্যস্ত হ'লেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তাঁরা সযত্নে যে আল তুলে এসেছেন, আল্ হিলাল্ সেই

আল কেটে দিল, সেই বাঁধ ভেঙ্গে দিল! হাউস্ অফ্ কমন্সে আল্ হিলাল নিয়ে প্রশ্ন উঠল এবং ঠিক হ'লো যে বাঁধ ভঙ্গকারীকে তার শাস্তি অবশ্যই নিতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধে 'ভারত-রক্ষা আইন' প্রথমেই আঁকড়ে ধ'রল আল্ হিলাল্‌কে। এই আইনের অক্টোপাসের মত আট হাতের চাপে আল্ হিলালের ঘটল অপমৃত্যু—আল্ হিলাল্ উঠে গেল!

আল্ হিলাল্ উঠে গেলে কি হয়? মৌলানার মধ্যে বিপ্লব ত' আর মারা যায়নি! তিনি আল্ বালাঘ্ নামে একখানি পত্রিকার প্রচার আরম্ভ ক'রলেন। বৃটিশ্ সিংহ ত' প্রায় ক্ষেপে উঠলেন এইবার। আল্ বালাঘ্‌কেও সামনের দুই থাবা দিয়ে আক্রমণ করলেন। আল্ বালাঘ্ ও তার সম্পাদক মৌলানা সাহেবকে একসঙ্গে বন্ধ করা হ'লো—একটির প্রচার, অপরের গতি। মৌলানা আজাদ হ'লেন অন্তরীণ।

সত্যসন্ধানী আজাদ অদম্য প্রাণশক্তি বলে আন্দোলনকে জয়যুক্ত ক'রতে সাহায্য ক'রছেন অনন্যসাধারণরূপে। খিলাফৎ, অসহযোগ ও যুবরাজের ভারত-সফর-বর্জন আন্দোলনে তিনি ছিলেন পুরোভাগে। পুরোভাগে থাকার অর্থই হ'লো আগেভাগে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অন্তর্হিত হওয়া। মৌলানা আজাদ আবার অন্তর্হিত হ'লেন। যখন বেরিয়ে এলেন, দেশবাসী তাঁকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল কংগ্রেস সভাপতির আসনে। বয়স তাঁর তখন মোটে ৩৫ বছর। জহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি হন প্রথম ৩৯ বছর

বয়সে। মৌলানার বেলায় সবই অত্যদ্ভুত! ষোলতে শাস্ত্রজ্ঞানের চূড়ান্ত, আঠারতে জ্ঞানী চমকান বক্তৃতা, পঁচিশের মধ্যেই মুসলমান জগতে আলোড়ন, ত্রিশের মধ্যেই বৃটিশ সিংহকে নাস্তানাবুদ আর পঁয়ত্রিশের মধ্যেই কংগ্রেসের সভাপতি!

দ্বিতীয়বার যখন তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করা হয় তখন তিনি বোধ করি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে তাঁর এইবারকার কার্যকাল কংগ্রেস সভাপতিদের কার্যকালের মধ্যে হবে দীর্ঘতম ও বৈচিত্রময়! সত্যিই রামগড়ের পর থেকে কংগ্রেস কর্তৃক কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ গড়বার জন্যে ওয়াভেলের আমন্ত্রণ গ্রহণ পর্যন্ত মৌলানা সাহেবের কার্যকাল বিস্তৃতিতে অতুলনীয় ও বৈচিত্রে ভরপূর। মহত্তর যুদ্ধ, ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে প্রস্তাব নিয়ে স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের ভারতে আগমন ও প্রস্তাব ফিরিয়ে নিয়ে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন, ব্যক্তিগত অসহযোগ-আন্দোলন, রাজাজীর মুস্লিম লীগের দাবী সমর্থন ক'রে কংগ্রেস পরিত্যাগ, 'ভারত ছাড়' দাবীর সমর্থণে বিপ্লব, ওয়াভেলের প্রস্তাব, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে নির্বাচন, ক্যাবিনেট মন্ত্রীদলের আগমন ও আলাপ-আলোচনা—এত বৈচিত্র্যময় ঘটনা আর কোন কংগ্রেস সভাপতির কার্যকালে ঘটেনি। মুস্লিম লীগ এই সময়েই অভূতপূর্বরূপে শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে এবং মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ক্রমশঃ স্তিমিত হ'য়ে আসে।

জাতীয়তাবাদের মশাল এই সময় মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা প্রজ্বলিত রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় হচ্ছেন মৌলানা আজাদ। একসময় কলমের জোরে তিনি সারা ইস্‌লাম জগৎ কাঁপিয়েছিলেন, আর এই সময় অপূর্ব স্থৈর্যবলে তিনি ভারতে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের পতাকা দৃঢ়হস্তে বহন ক'রে নিয়ে গেছেন।

ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে বিরোধিতা তা তাঁর মতে হ'লো উপরিস্থিতলগত। এই বিরোধকে দূর ক'রতে হ'লে একটা সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার দরকার। যেদিন এই সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার ওপর ভারতের এই দুই সম্প্রদায় কাজ ক'রবে সেইদিনই বিরোধিতা ক'রবে বিদায়গ্রহণ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ঘটবে একটা রূপান্তর যে রূপান্তরের সঙ্গে দেশের দরিদ্র, অজ্ঞ জনসাধারণ বিশেষ পরিচিত না হ'লেও সহজেই খাপ খাইয়ে চ'লতে পারবে। এই হ'লো তাঁর মতে হিন্দু মুসলমান সংঘাতের প্রজ্ঞামূলক সমাধান।

১৯২০ সাল থেকে গান্ধীজির সহকর্মী ও বন্ধু হ'লেও গান্ধীবাদকে তিনি কখনও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রতে পারেন নি। গ্রাম-সংঘটন, কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে গান্ধীজির মতামত তাঁর মনকে বিশেষ নাড়া দেয় না। তিনি হ'লেন পুরোনো যুগের রাষ্ট্রনীতিবিদের মধ্যে অত্যুদার-মতাবলম্বী বা র‍্যাডিক্যাল্‌, এবং সেই জন্যেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতি সঠিক সহানুভূতি-সম্পন্ন।

বীরপূজা কখনও তিনি পাননি তার কারণ হ'লো তিনি জননেতা নন। তাঁর বৈদগ্ধ এবং তাঁর গ্রন্থ-প্রীতি তাঁকে জনসাধারণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। গ্রন্থাগারের আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি অপার শান্তিতে থাকেন কিন্তু গ্রন্থাগারের গ্রন্থারণ্যের পরিবর্তে যখন তাঁকে জনসমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তাঁর প্রকৃত সত্বা হয় উধাও। কর্মশক্তি তাঁর অসীম কিন্তু কর্মব্যস্ততা তাঁর ভাল লাগে না। রাষ্ট্রনীতি তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নয়। রাষ্ট্রনীতির মধ্যে না থেকে উপায় নেই বলেই তিনি আছেন, আরও আছেন কারণ তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ছাড়বেন না।

জহরলালের মত দিনে পনেরটী জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া আজাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তাঁর বাগ্মিতার ও চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় দু' চার জনে মধ্যে—কমিটিতে। সেখানে আজাদ তাঁর মনগ্রন্থ খুলে দিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে যান। তাঁর সহকর্মীরা অবাক হন তাঁর বৈদগ্ধ ও চিন্তাশক্তি দেখে। জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া অপছন্দ ক'রলেও তিনি হ'লেন ভারতের অন্যতম কথাকুশলী বাগ্মী। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে যেমন যুক্তিপূর্ণ সংলাপের দ্বারা অবাক ক'রে দিয়েছেন তেমনি বিরাট জনসভাবেও নীরব, নিশ্চল ক'রে রেখেছেন তাঁর বাগ্মিতার দ্বারা।

আত্মসম্মানবোধ আজাদের অতিমাত্রায়। এই আত্মসম্মান-বোধের জন্যেই তিনি বিদেশী ও বিভাষীর সঙ্গে কথাবার্তা

চালান নিজের ভাষায় অপর কারও সাহায্যে। অনেকের ধারণা আছে যে ইংরেজীতে তিনি অনভিজ্ঞ। ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। ইংরেজীতে তাঁর জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা সাধারণ লোকের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। জহরলাল একবার বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ইংরেজী জ্ঞান আজাদের কারও চেয়ে কম নয়। লুই ফিসারের বিবৃতিতে পাই যে আজাদ যখন দোভাষীর সাহায্যে কোন ইংরেজের সঙ্গে কথা বলেন তখন দোভাষীকে কেবল আজাদের কথাগুলোই অনুবাদ করতে হয়, ইংরেজ ভদ্রলোকের কথাগুলো নয়। এই কথা ব'লে লুই ফিসার মন্তব্য ক'রেছেন যে আজাদ ইংরেজী ভালই জানেন কিন্তু নিজে ইংরেজীতে কথা ব'লতে কিন্তু কিন্তু করেন। আত্মসম্মানবোধপ্রসূত মাতৃভাষায় এই যে কথা বলা এ হ'লো মৌলানার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ধূমপান, সঙ্গীত ও গ্রন্থাগার হ'লো তাঁর প্রিয় বস্তু। তিনি একজন বিরামবিহীন ধূমপায়ী। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীজির বক্তৃতার সময়ও তিনি পরের পর সিগারেট খেয়ে চ'লেছেন আর উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত পেলে সেখানে তিনি লাইব্রেরীর শান্ত আবেষ্টনী ছেড়ে গিয়েও বসেন।

আলাপচারী হিসেবে মৌলানা সাহেবের জুড়ি মেলা ভার। তাঁর যদি মুড্ থাকে ত' আলাপ-নিরত শ্রোতা দেশবিদেশের প্রাচীন ও সাম্প্রতিক ইতিহাস সিনেমার মত দেখতে পাবেন—

চোখের সামনে। ফরাসী বিপ্লবের আগের যুগের এনসাইক্লো-পিডিষ্টদের মত আজাদ জ্ঞানভারতীর পাতা খুলে যান শ্রোতার সামনে পরের পর। এবং শ্রোতা অবাক হ'য়ে বলে …"এমন 'লোকটি' কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি।"

রাজেন্দ্রপ্রসাদ

একজন বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা যখন তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন তখন তাঁকে কংগ্রেসে যোগদান ক'রতে আহ্বান করা হয়। আহ্বানের উত্তরে তিনি বলেন যে তিনি নিশ্চয়ই কংগ্রেসে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক হবেন কিন্তু তা তখুনি সম্ভব নয়। যেদিন আইন-ব্যবসায়ে তাঁর আয় মাসিক হাজার টাকায় দাঁড়াবে সেদিন তিনি আপনা থেকে কংগ্রেসের খাতায় নাম লেখবেন—আহ্বানের প্রয়োজন হবে না। এই কংগ্রেস-নেতা মাসিক হাজার ছাড়িয়ে দুই, পাঁচ, দশ হাজারও উপায় ক'রেছেন এবং উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা-সংগ্রামেও লড়েছেন—তবে ঐ সঙ্গে সঙ্গে। আজ তিনি পরলোকে তাই নামটা আর করলুম না।

আর একজন বিখ্যাত ব্যবহারাজীব আইন-ব্যবসা ছেড়ে যখন অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দেন তখন তাঁর বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি নাকি ব্যবসা একেবারে ছাড়ছ?"

"হ্যাঃ, একেবারে।"

"সংসার চালাবে কি ক'রে? অনেক টাকা জমিয়েছ নিশ্চয়!"

"নিশ্চয়।"

"আন্দাজ কত জমিয়েছ?"

"আন্দাজের প্রয়োজন নেই—আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আজ, এই মুহূর্তে হ'লো পনের টাকা।"

"মাত্র!"

উত্তরে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ শুধু একটা ছোট্ট "হ্যাঃ" বললেন।

পাটনা হাইকোর্টে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বছরে অনেক টাকা উপার্জন ক'রতেন। তাঁকে জজ করার কথাও হ'য়েছিল। অনেক টাকা যেমন উপার্জন ক'রতেন তেমনি খরচও ক'রতেন সবটাই—কখনও কখনও উপার্জনের চেয়েও বেশী। খরচ ক'রতেন নিজের পিছু নয়। নিজের অভাব তাঁর অতি সামান্য এবং সারল্যপূর্ণ জীবনযাপনই তাঁর আদর্শ। খরচ ক'রতেন তিনি সাধারণের নানারকম কাজে এবং দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য ক'রে।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র আর কেউ নেই। ক'লকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে সকলকে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা তখন ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা আসাম ও ব্রহ্মদেশ নিয়ে। রাজেন্দ্রপ্রসাদের আগে কোন অবাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কৃতিত্ব লাভ করা সম্ভবপর হয়নি। এন্‌ট্রান্সই প্রথম কিন্তু শেষ নয়। পরের পর পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে পরীক্ষায় প্রথম

হওয়াটা বেড়ান, হাওয়া খাওয়া, জলখাবারের মতই সোজা। ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ—এবং তপস্যার ফল যে এই কলিযুগেই হাতে হাতে পাওয়া যায়—একথা রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেয়ে কেউ ভাল ক'রে প্রমাণ ক'রতে পারেন নি। শুধু পরীক্ষায় নয়, অধ্যাপনাতেও তিনি নূতনত্বের গোড়া পত্তন ক'রেছেন।

অধ্যাপনা ক'রেছেন তিনি অনেক বিষয়ের—ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং আইন—সবেরই। প্রতিভা যাকে স্পর্শ করে তাকেই সজীব ক'রে তোলে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে শুষ্ক, দুরূহ অর্থনীতিকে ইংরেজী সাহিত্যের মতই সরস ক'রে তুলেছিলেন; আইনের কূট ব্যাখ্যা ও ইতিহাসের ঘটনাবলীর ধারাকে একই পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কথায় আছে যে অধ্যয়ন করা সহজ কিন্তু অধ্যাপনা করা সহজ নয়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই কথাই প্রমাণ ক'রে গেছেন যে অধ্যাপনা শক্ত তাদের পক্ষে যারা শুধু পরীক্ষা-পাশের জন্যেই পড়ে। জ্ঞানের গভীরতা যেখানে সহজেই তলস্পর্শী, অধ্যাপনা যেখানে হয় কেবল মুখস্থ থেকে আওড়ান সুতরাং কঠিন ও অপ্রীতিকর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অল-রাউণ্ডার। গোখলে রাজেন্দ্রপ্রসাদের এই চৌকষতা লক্ষ্য ক'রেছিলেন গভীর আগ্রহ ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে। এ ছেলের দ্বারা ত' অনেক বড় কাজ হ'তে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের আবেষ্টনীর

বাইরে ত' একে আনতে হবে !—ভাবলেন গোখলে। রাজেন্দ্র-প্রসাদের কাছে ডাক এল গোখলের, এস আমার 'সারভ্যান্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'তে যোগ দাও।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব'ললেন, নিশ্চয়ই যোগ দেব।

সব চেয়ে প্রিয়জন, তাঁর বড়দা বললেন,—তাও কি হয় ? তোমার সামনে র য়েছে অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব'ললেন, ভবিষ্যৎ আমার উজ্জ্বলতর হবে যদি আমি যোগ দিই—যদি আমি যাই।

বড়দা বললেন, যেওনা, আমাদের কথা শোন !

যাওয়া হ'লোনা।

গোখলে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে টানতে পারলেন না, টানলেন গান্ধীজি। রাজেন্দ্রপ্রসাদই পূর্ব-ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বপ্রথম গান্ধীজির পতাকা-তলে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। গান্ধীজি তখন সবেমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছেন এবং নগণ্য অনুসরণকারীর দল নিয়ে সমুদ্রপ্রমাণ অন্যায়-ধারার বিরুদ্ধে বালির বাঁধের মত গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। এই রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্যে তিনি এলেন বিহারের চম্পারণে—রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিজের প্রদেশে। নীলচাষীদের প্রতি অত্যাচার ও অন্যায়ের বোঝা নামাবার চেষ্টায় যেই গান্ধীজি এলেন চম্পারণে অমনি তাঁর প্রতি আদেশ হ'লো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিহার প্রদেশ ছেড়ে যেতে। আজ্ঞায় অন্যায় যেখানে আছে গান্ধীজি মাথা নোয়াননি

সেখানে কখনও। তিনি চম্পারণ না ছাড়াতে এলো দণ্ডাজ্ঞা। এবং তারপর সুরু হ'লো বিরাট আন্দোলন। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আন্দোলনের ফলে সরকার বাধ্য হ'য়ে একটা তদন্তের ব্যবস্থা ক'রলেন এবং তদন্ত-কমিটির অন্যতম সদস্য হ'লেন মহাত্মা গান্ধী। চম্পারণে রাজেন্দ্রপ্রসাদ হ'য়ে উঠলেন গান্ধীজির দক্ষিণ হস্ত। দু'জনে মিলে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে চাষীদের কাছ থেকে অত্যাচারের বিবরণী সংগ্রহ ক'রতে লাগলেন; সংগ্রহের শেষে দেখা গেল যে বিবরণীর সংখ্যা হ'য়েছে সাত হাজার। চম্পারণে ভারত গান্ধীজির ললাটে পরালে প্রথম জয়টীকা আর চম্পারণই লেখালে রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম গান্ধীজির খাতায়!

অসহযোগ-আন্দোলনে রাজেন্দ্রপ্রসাদ হ'লেন বিহারের অবিসংবাদী নেতা। গ্রন্থাগার ও শিক্ষায়তনের মাঝে যেমন তিনি অধ্যয়নকে তপস্যা ক'রে নিয়েছিলেন তেমনি এই নবকর্মক্ষেত্রেও তিনি আন্দোলনকে ক'রে নিলেন তপস্যা। এই তপস্যায় তাঁর গঠনমূলক কর্মশক্তি ও বহুমুখী প্রতিভা প্রতিভাত হ'তে লাগল।

আন্দোলন বা বিপ্লব অধিকাংশ সময় শুধুই ভাঙ্গে, গ'ড়তে পারেনা। শুধুই ভেঙ্গে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করে। কদর্যতা বোধ করি শূন্যতার চেয়ে ভয়াবহ নয়! কংগ্রেস ডাক দিয়েছে—'বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার গণ্ডীর বাইরে এস। এই যে শিক্ষা এ প্রকৃত শিক্ষা নয়; এ হ'লো

ভুল শিক্ষা, কুশিক্ষা।' দলে দলে ছাত্র ছাড়ল স্কুল, কলেজ। ছাড়ল ত', তারপর? রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য। সদস্যপদ ত্যাগ ক'রে তিনি গ'ড়লেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে জাতি গঠন করা যেতে পারে। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে হ'লো বিহারের বিদ্যাপীঠ। বিদ্যাপীঠের সঙ্গে সংযুক্ত হ'লো ৬৫০টি বিদ্যালয়। এবং ষাট হাজারের ওপর ছাত্রকে এই বিদ্যালয় করতে লাগল ভবিষ্যতের জন্য গঠন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ হ'লেন এর ভাইস্ চ্যান্সেলর। বিদ্যাপীঠ, গঠনমূলক জাতীয় কাজের জন্যে, দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতে লাগল। ব্যাপার দেখে সরকার ত' গেলেন ঘাবড়ে। এবং চিরাচরিত নীতির অনুসরণ ক'রে বিদ্যাপীঠকে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা ক'রলেন। দেশের পক্ষে কোন শিক্ষা কল্যাণকর হবে তারও নির্ধারণের ভার ছিল বিজাতীয় সরকারের ওপর!

রাজেন্দ্রপ্রসাদের সংগঠন-শক্তির পূর্ণ প্রকাশ পায় ১৯৩৪ সালে, বিহারের ভূমিকম্পে। ভূমিকম্পের দু'দিন পরে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি দেওয়া হ'য়েছিল ভূমি-কম্পের কবলে পতিত দুর্গতদের সাহায্য করবার জন্যে নয়, মুক্তি দেওয়া হ'য়েছিল তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য—মেডিকেল বোর্ডের উপদেশানুযায়ী। বারবার দীর্ঘদিন ধ'রে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থেকে তাঁর স্বাস্থ্য গিয়েছিল একেবারে ভেঙ্গে এবং তিনি আক্রান্ত হ'য়েছিলেন কঠিন হাঁপানী রোগে। রোগ এমন

অবস্থায় দাঁড়াল যে সরকার চিকিৎসকমণ্ডলীর অভিমত নিতে বাধ্য হলেন। এবং ফলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ পেলেন ছাড়া। ছাড়া পেয়েই তিনি গেলেন সোজা ভূমিকম্প-বিধ্বস্তদের মধ্যে। তিনি যে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন একথা তাঁর স্মরণই হ'লো না। বিহার সেনট্রাল রিলিফ্ কমিটি সংগঠিত হ'লো এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ হ'লেন তার সভাপতি। শীর্ণদেহ, অবসন্ন মন নিয়ে, মরণের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কেউ কি এভাবে কাজ ক'রতে পারে?—দেশের লোক অবাক হ'য়ে ভাবল। এবং ঐ শীর্ণকণ্ঠের আহ্বানে অদ্ভুতভাবে সাড়া দিল। রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামে দুর্গতদের জন্য যে সাহায্যভাণ্ডার খোলা হ'য়েছিল তাতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অর্থসাহায্য এল আঠাশ লক্ষ টাকা। তা ছাড়াও এসেছিল অপরিমেয় খাদ্যশস্য ও ঔষধপত্র।

সরকারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এতে বিশেষ অস্বোয়াস্তি বোধ ক'রতে লাগলেন! এ কি রকম হ'লো! রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামে এইরকম ভাবে রিলিফ্ আসছে! অল রাইট্, ডরো মৎ! তাঁরাও খুললেন এক বিহার-দুর্গত-সাহায্য-ভাণ্ডার ভাইস্রয়ের নামে। এই সাহায্য-ভাণ্ডারে সাহায্য পাঠাবার জন্যে তাঁরা ডাকলেন দেশীয় রাজন্যবর্গকে, বড় ব্যবসায়ীদের, বড় জমিদারদের—বড় বড়দেরই। চাঁদা উঠলে দেখা গেল যে এই তহবিল রাজেন্দ্রপ্রসাদের তহবিলের চেয়ে মাত্র কয়েক লক্ষ টাকায় পুষ্ট।

তাঁর অসামান্য ত্যাগ, সরল ও নিরহঙ্কার জীবনযাপন অনেক সময় অত্যদ্ভুত ঠেকে। মাত্র পনের টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখে, ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে হঠাৎ অসহযোগীদের সঙ্গে সহযোগিতায় নামা ক'জনের পক্ষে সম্ভব? কংগ্রেস যখন বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ক'রল তখন রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বিহারের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য অনেক উপরোধ অনুরোধই করা হয়েছিল। তাঁর চারিত্রিক স্বার্থশূন্যতা নিয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ জানালেন যে গদীতে বসবেন তাঁর সহকর্মীরা, তিনি নন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের আর একটি নাম আছে। নামটি হ'লো 'গ্রেট্ জেণ্টল্‌ম্যান ওফ্ ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স।' ভদ্রব্যক্তির অলঙ্কার হ'লো নিরহঙ্কার ও সরলতা। সরলতায় তিনি গান্ধীশিষ্যদের মধ্যে অপর সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। সাধারণ পশ্চিমা নাগরা পায়ে দিয়ে, মোটা খদ্দরের পোষাক প'রে যখন তিনি ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন তখন অপরিচিতের পক্ষে কোনরকমে বোঝবার উপায় নেই যে ইনিই ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আপনজন ভেবে পার্শ্বোপবিষ্ট কোন বাঙ্গালী ছোকরা বা পশ্চিমা অনেক সময় সম্বোধন করেই ফেলে, "শিলাই হ্যায় ভেইয়া?" অথবা "বিঁড়ি পিয়োগে?"

শোনা গল্প। শোনা যাঁর মুখে তিনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, তখন ছিলেন ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্র এবং তিনিই হ'লেন এই গল্পের নায়ক। তাঁর পিতাও ছিলেন সরকারী কলেজের অধ্যাপক। তাঁর আর তাঁর পিতার আসল

নামটি প্রকাশ ক'রলুম না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন বিদ্যাপীঠে বিদ্যাবিতরণ ক'রছেন। এই সময় একবার কলকাতায় এসে একদা-সহকর্মী আমাদের অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা ক'রতে যান। অধ্যাপক ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে তাঁর পুত্র চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া তৈরী করছিল। হঠাৎ একজন সাধারণ বিহারী ভদ্রলোক (যদিও ভদ্রলোকের পর্যায়ে আগন্তুক পূর্ণভাবে পড়েন কিনা সে বিষয়ে ছেলেটির যথেষ্ট সন্দেহ ছিল!) একেবারে ঘরের মধ্যে হাজির দেখে ছেলেটি অবাক। এসেই আবার জিজ্ঞাসা, "ক্যা নরেন্দ্রবাবু ঘরমে হ্যাঁ?"

"হ্যায়," ছেলেটি বলল।

"বোলাও ত"-ভদ্রলোকের সুরে কোনরকম জড়তা নেই।

বোলাইয়ের পরিবর্তে বোলাও অর্থাৎ আপনির পরিবর্তে তুমি বলাতে ছেলেটি রীতিমত চটে গেল। একজন সাধারণ পশ্চিমা (অন্ততঃ বেশভূষায় তার চেয়ে বেশী কিছু বলে মনে হয় না) তার মত ইণ্টারমিডিয়েটের ছেলেকে বলে কিনা 'তুমি।' সেও তাই ফিরিয়ে ব'ললে 'তুমি'—"বৈঠ্ যাও। থোড়া বাদ বাবু আবেগা।" বলে ঘরের একদিকে সাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট একটা বেঞ্চি দেখিয়ে দিল। লোকটি বা ভদ্রলোকটি তখন আস্তে আস্তে সেই চেয়ার টেবিলের কাছ থেকে দূরে গিয়ে সেই বেঞ্চিতে বস্‌ল। ছেলেটি তখন আরও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইংরেজী ইতিহাস পাঠ ক'রতে লাগল। ভাবটা এই যে তার মত ইংরেজীতে অভিজ্ঞ যুবককে 'তুমি'

ব'লে সম্বোধন করাটা আগন্তুকের পক্ষে মোটেই সমীচীন হয়নি। আগন্তুক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ব'সে, "ক্যা পড়্ রহে হো?" তার ধৃস্টতায় আশ্চর্য ও বিরক্ত হ'য়ে ছেলেটি ব'লে, "হিস্ট্রি, ইংলিস হিস্ট্রি—তুম্ নেহি সম্‌জোগে।" আগন্তুক চুপ ক'রেই যায় এবং এমন ভাব দেখায় যে ইংরেজীতে ইতিহাস সত্যি সত্যিই তার পক্ষে অনুধাবন একেবারে অসম্ভব।

কিছুক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করার পর নরেনবাবু বাইরের ঘরে এসেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলেন, "একি রাজেন্দ্রবাবু যে! কখন এলেন? খবর দেন নি কেন? ওখানে ওভাবে ব'সে কেন?" ব'লতে ব'লতে একেবারে জড়িয়ে ধ'রে উচ্ছ্বাসের শেষ ক'রতে চান।

আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই রাজেন্দ্রপ্রসাদ "ও লেড়কা ··," বলে লেড়কার দিকে তাকিয়ে দেখেন যে লেড়কা পগার পার—কখন ঘরের মধ্য থেকে নিঃশব্দে সরে পড়েছে।

তাঁর এই ধরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে ক'রে তুলেছে সবচেয়ে ভদ্র ব্যক্তি। কংগ্রেস ও কংগ্রেসের বাইরে তিনিই হলেন একমাত্র নেতা যাঁর রাষ্ট্রনৈতিক শত্রু একেবারে নেই। ভদ্রলোকের কি শত্রু থাকে? তাই ভাবি যে পলিটিক্স্ যখন ভদ্রলোকেরই করণীয় তখন পলিটিসিয়ানরা ভদ্র হবেন না কেন!

সময় সময় ভদ্রলোকেরও শত্রু থাকে। এই শত্রুবিহীন ভদ্রলোককেও অভদ্রের হাতে প্রহার সহ্য ক'রতে হ'য়েছিল

ভীষণভাবে, অন্যায়মতে। ৪৪ বছর বয়সে রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথম সমুদ্র পাড়ি দেন। য়ুরোপের অনেক দেশ ঘুরে যখন অষ্ট্রিয়ায় এসে হাজির হন তখন তাঁকে এক সভায় অহিংস-প্রতিরোধকে ব্যাখ্যা ক'রতে অনুরোধ করা হয়। সভাটি আহুত হ'য়েছিল একদল শান্তিকামী বা পেসিফিষ্ট্‌দের দ্বারা। সভায় কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আর বক্তৃতা ক'রতে হয়নি। একদল অশান্তিকামী বা এ্যান্টি-পেসিফিষ্ট সভা ভেঙ্গে দেয় গায়ের জোরে এবং রাজেন্দ্রবাবুকে আহত করে গুরুতরভাবে।

অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ বক্তৃতা করেন। তিনি হ'লেন, ইংরেজীতে যাকে বলে 'হোমলি স্পীকার'। সাতটা ভাষাভিজ্ঞ, পাণ্ডিত্যের সমুদ্রে ডুব দেওয়া কোন কারও পক্ষে এই রকমভাবে সোজা ভাষায় বক্তৃতা করা যে সম্ভব তা রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতা না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। কোন অলঙ্কার নেই, আড়ম্বর নেই সোজা তিনি মনের কথা শ্রোতার মনের দোরে পৌঁছে দেন। গণতান্ত্রিক যুগের যে একটা আলাদা ভাষা আছে এবং সে ভাষা হ'লো আপামর-সাধারণের জন্যে এ কথা রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেয়ে আর কেউ বেশী করে হৃদয়ঙ্গম করেন নি। লোককে বক্তৃতায় চমকে দেওয়া সহজ কিন্তু মনের কথা মনের ভেতর গেঁথে দেওয়া শক্ত!

যত অপ্রীতিকর ও কঠিন কাজ ক'রবার ভার পড়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদের ওপর এবং তিনি তা গ্রহণ করেন কঠিন

কর্তব্যের মতই। নেতাজী সুভাষ যখন ১৯৩৯ সালে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে পদত্যাগ করেন তখন সারা দেশে হৈ চৈ পড়ে গেল। বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের ওপর বিশেষ ক'রে গান্ধীজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ওপর মহা খাপ্পা হ'য়ে উঠল। ফরওয়ার্ড ব্লক জন্ম-গ্রহণ ক'রল এবং কংগ্রেসের তরী টলটলায়মান হ'য়ে উঠল। ডাক প'ড়ল রাজেন্দ্রপ্রসাদের—এস কংগ্রেসের নেতৃত্ব কর। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এগিয়ে এলেন। কংগ্রেস যখন কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ক'রল তখন রাজেন্দ্রপ্রসাদের ডাক প'ড়ল—এস খাদ্য-বিভাগ পরিচালনা কর। খাদ্যবিভাগের মন্ত্রীত্ব করা মানে হ'লো নিজের জনপ্রিয়তাকে সোজা জলাঞ্জলি দেওয়া। পৃথিবীময় খাদ্যসংকট চ'লছে, ভারতে অতিমাত্রায়। অজ্ঞ জনসাধারণ। এই অজ্ঞতার জন্যেই তারা আশা ক'রেছিল যে ক্ষমতা-হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে চাল-ডাল-আটা-চিনি হ'য়ে উঠবে নদীর জলের সহজপ্রাপ্য এবং কলের জলের মত সুলভও। রাতারাতি যে তা হওয়া সম্ভব নয় তা তারা বুঝবে না। এ হেন অবস্থায় খাদ্যবিভাগ পরিচালকের জনপ্রিয়তা একদিনেই কর্পূরের মত উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, বেশ, আমিই নেব ঐ বিভাগের দায়িত্ব। ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর জনসাধারণ আশা ক'রেছিল যে রাতারাতি দেশময় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেবে এবং ভারত হ'য়ে উঠবে ক্ষীর-সাগর ও দুধ-সাগরে ঘেরা দেশ। মহত্তর যুদ্ধের বিরাট ফলাফল যে

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে ব্যতিব্যস্ত ক'রছে এ কথা তারা বুঝতেই চায় না। তার ওপর হ'ল খণ্ডিত ভারতে ক্ষমতা-হস্তান্তর। এ কথাও অনস্বীকার্য যে ক্ষমতা-হস্তান্তর কংগ্রেসের অধিকাংশের মনে এনে দিয়েছে একটা লোভ। এবং হস্তান্তরিত ক্ষমতা ভাগাভাগি ক'রে ভোগ ক'রবার জন্যে নানারূপ জঘন্য ব্যাপার চলছে। সব মিলিয়ে কংগ্রেসকে দাঁড় করিয়ে এক মহাপরীক্ষার সামনে। এই পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া বিশেষ কঠিন। এই টাইফুনের মধ্যে নৌকো তীরে ভেড়াবার ভার প'ড়েছে আবার রাজেন্দ্রপ্রসাদের ওপর।

সমালোচকেরা তাঁর দু'টী দোষ দেখান। প্রথমে হ'লো তাঁর নিজের প্রদেশের কিষাণ-আন্দোলন তাঁর সহানুভূতি ভালভাবে আকর্ষণ ক'রতে পারেনি। বিহারের কৃষকেরাই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উর্ধহারে খাজনা দেয়। এ সত্ত্বেও বিহারে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতি ও সহায়তা কখনও দেখা যায়নি। বিহারই ভারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ব্যাপারে অগ্রণী হ'লেও এতে নাকি রাজেন্দ্রপ্রসাদের দান বিশেষ নেই!

বঙ্গবাসীরা—আজকাল পশ্চিম দেশবাসীরা তাঁর আরও একটি দোষ দেখান। তিনি নাকি বাঙ্গালী-বিদ্বেষী এবং তাঁর স্বপ্রদেশ প্রীতি খুবই বেশী। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা বলেন যে রাজেন্দ্রপ্রসাদই ১৯০২ সালে ক'লকাতায় বিহারী ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করে ও ১৯০৬ সালে বিহারি-ছাত্র সম্মেলনে প্রধান

উদ্যোক্তা হ'য়ে প্রাদেশিকতার গোড়াপত্তন করেন এবং বাংলা ও বিহারের মধ্যে সাপে-নেউলের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। আমরা আজ সে বিচার ক'রতে পারব না, সে বিচার ক'রবে ভবিষ্যকাল কিন্তু আজ একথা সত্য রাজেন্দ্রপ্রসাদের সম্মুখে র'য়েছে এক মহাপরীক্ষা। পরীক্ষার চেয়ে তিনি উভয় সংকটের সম্মুখীন হ'য়েছেন ব'ললে ঠিক বলা হবে। আজ পশ্চিম বাংলা বিহারের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে নিজ অন্তর্ভুক্ত ক'রতে চাইচে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নি—কিন্তু তাঁকে কথা বলতেই হবে। কারণ তিনিই আজ কংগ্রেসের কর্ণধার। যদি তিনি বাংলার স্বপক্ষে রায় দেন তবে স্বপ্রদেশবাসীরা তাঁর ক্ষেপে যাবে আর যদি বাংলার বিপক্ষে যান তা হ'লে তিনি যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী পশ্চিমবঙ্গবাসীদের এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হবে। আজ তিনি শয়তান ও গভীর সমুদ্রের মাঝে। কি ক'রে সাঁতরে পার হন বা ওপরে উঠে যান—এটাই হ'লো লক্ষ্য ক'রবার বিষয়!

রাজা গোপালাচারী

"বেতের ওপর ভর দেওয়া তাঁর শীর্ণদেহ, খদ্দরের পোষাকের ভেতর থেকে ওঠা তুরস্ক দেশীয় কাঁধের ওপর বসান তাঁর কেশহীন, ডিম্বাকৃতি মস্তিষ্ক নিয়ে তাঁকে অ'তি দুর্বল ব'লে মনে হয় কিন্তু তিনিই হ'লেন প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতের বড়লাট হ'লেন এবং তাঁর সুনাম আছে যে তিনি সমস্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন।"

মহামান্য চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী অনেকগুলি নামে পরিচিত যেমন হ'লো 'তালিম গান্ধী', 'রাজাজী',—তাঁর নামের আদ্যক্ষর 'সি, আর,' ইত্যাদি। এর মধ্যে আদ্যাক্ষর দুটিই সমধিক পরিচিত। বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও রাজা-গোপালাচারীকে নিয়েই ছিল গান্ধীজির 'ট্রায়ামভাইরেট্'। গান্ধীজি দিতেন পথের নির্দেশ, নির্দেশের ব্যাখ্যা ক'রতেন সি, আর, ব্যাখ্যার পর দলবল নিয়ে পথ দিয়ে এগোতেন সর্দার প্যাটেল এবং পথের মধ্যে যদি কোন অপ্রীতিকর, কঠিন কাজ ক'রতে হ'তো তবে বিশেষ করে ডাক প'ড়ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের। না হ'লে রাজেন্দ্রপ্রসাদ চলতেন সর্দারজীর ঠিক পিছু পিছু। এই ভাবেই ট্রায়াম্‌ভাইরেট্ চালিয়ে এসেছেন গান্ধীজি।

গান্ধীজির দেওয়া নির্দেশ, বিবৃতি, ধ্যানধারণা সব কিছুরই ব্যাখ্যা ক'রে এসেছেন চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী এবং গান্ধীজির নিজের কথাতেই রাজাজী হ'লেন গান্ধীজির অথরিটেটিভ্ ইণ্টারপ্রেটার। গান্ধীজি কিছু একটা ব'লেই শেষ ক'রলেন—বোঝাবার ভার সি, আর, এর ওপর। সি, আর যদি বোঝাতে অক্ষম হ'তেন তবেই গান্ধীজি তাঁর প্ররোচনা বা পারসুয়েশন্ ব্যবহার ক'রতেন। অসহযোগ-আন্দোলনে গান্ধীজি গেলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। তাঁর পত্রিকা 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' চালাবে কে? কে আবার চালাবেন—সি, আর!

এই রকমভাবে ১৯২০ সালের আগে থেকে সি, আর গান্ধীজির নীতির ব্যাখ্যা ও প্রচার ক'রে এসেছেন। ১৯২২ সালে গয়া-কংগ্রেস গান্ধী-নীতি প্রতিযোগিতায় আহুত হ'লো। আহ্বানকারীদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল। তাঁরা বললেন অসহযোগের আশায় ব'সে আর জাল বুনলে চলবে না, সহযোগিতার মধ্য দিয়েই পথ প্রস্তুত করে নিতে হবে; কংগ্রেসের পক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের ও কেন্দ্রের আইন-পরিষদে ঢোকবার চেষ্টা ক'রতে হবে। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা ক'রে গান্ধী-নীতি বিশ্বাসীদের অধিনায়কত্ব ক'রলেন সি, আর। আইন-পরিষদে ঢোকার বিরুদ্ধে তাঁর দলকে এমনভাবে পরিচালিত ক'রলেন যে দেশবন্ধু, মতিলালের মত বড় বড় রথীরাও হ'য়ে গেলেন অবাক। তামিলল্যাণ্ডের

তালিম-গান্ধী সেদিন মহাত্মা গান্ধীর বিজয় পতাকা বহন ক'রলেন। ফলে দেশবন্ধু ছাড়লেন কংগ্রেসের সভাপতির পদ এবং প্রতিষ্ঠা ক'রলেন স্বরাজ দলের। কংগ্রেসের সম্মুখে এলো মহা দুর্দিন। কিন্তু হঠাৎ জহরলাল ও আবুল কালাম আজাদের কারামুক্তি হওয়াতে দুর্দিনের মেঘ ঝড়ে উড়ে গেল। দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন ব'সল এবং যুবনেতা আবুল কালাম হ'লেন সভাপতি। দিল্লীর অধিবেশনে একটা রফা হ'লো এবং যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'লো তাতে, কংগ্রেসকে নয়, ব্যক্তিগত ভাবে কংগ্রেস-কর্মীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে ও ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া হ'লো। অর্থাৎ সরকারীভাবে কংগ্রেস নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত হবেনা তবে যে কংগ্রেস-কর্মী ইচ্ছা ক'রবেন তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে ভোট দেওয়ায় বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন বাধা থাকবে না।

গান্ধীজি ও তাঁর ইন্টারপ্রেটার রাজাজী এই মীমাংসা বাধ্য হ'য়ে মেনে নিলেন। মেনে নিলেও রাজাজী আইন পরিষদে প্রবেশকে তখন মোটেই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারলেন না। দিল্লীর অধিবেশন তাঁর পক্ষে একটা বিশেষ বেদনাদায়ক ব্যাপার হ'য়ে রইল। আইন-পরিষদে ঢোকার অনুমতি হ'লো আপোষের দ্বারা। আপোষ ত' কখনও এক্সট্রিমিস্টকে শান্তি দিতে পারে না।

ইতিহাস কিন্তু সুন্দরভাবে এর প্রতিশোধ নিল। পনের

বছর পরে একদা আইন-পরিষদে প্রবেশের ঘোরতর বিরোধী, গয়া-কংগ্রেসে দেশবন্ধুর পরাজয়ের ও পরে পদত্যাগের প্রত্যক্ষ কারণ রাজাজীই দাঁড়ালেন তাঁর সমস্ত প্রভাব নিয়ে ঠিক বিপরীত দিকে—কংগ্রেসকে আইন পরিষদে প্রবেশ করাবার উদ্দেশ্যে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস যখন বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হ'য়ে দাঁড়াল তখন মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সপক্ষে সি, আর, ই, হ'য়ে দাঁড়ালেন প্রধান সমর্থক ও উদ্যোক্তা।

১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পর বিভিন্ন প্রদেশের আইন-পরিষদে কংগ্রেসই হ'য়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। নিয়ম-তান্ত্রিক নীতি অনুসারে ঐ প্রদেশের গভর্ণররা আমন্ত্রণ ক'রলেন আইন-পরিষদের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মন্ত্রীসভা গঠন ক'রবার জন্যে। মাদ্রাজের আইন পরিষদের কংগ্রেসদলের নেতা হয়েছিলেন সি, আর। নির্বাচনের পরই কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে যদি গভর্ণরেরা এইরকম প্রতিশ্রুতি না দেন যে তাঁরা তাঁদের 'বিশেষ ক্ষমতা' ব্যবহার ক'রবেন না বা ক্যাবিনেটের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রবেন না, তবেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা-গঠনের আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রবে—নচেৎ নয়। সি, আর এর কাছে আমন্ত্রণ এল। সি, আর, আর সকলের মত, জানালেন যে আগে প্রতিশ্রুতি চাই পরে আমন্ত্রণ গ্রহণ। গভর্ণরেরা ব'ললেন—এরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয় কারণ ১৯৩৫ সালের শাসন-পদ্ধতি তাঁদের এরকম প্রতিশ্রুতি

দেবার ক্ষমতা দেয়নি। এই নিয়ে চ'লল বাদানুবাদ। এই সম্পর্কে আইনের কূটব্যাখ্যা নিয়ে ভারতবর্ষ ও বিলাতের সংবাদপত্রে গরম হ'য়ে উঠ্‌ল। লর্ড জ্যেঠল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ ক'রে স্যর তেজবাহাদুর শপ্রু পর্যন্ত এই ব্যাপার নিয়ে মত প্রকাশ ক'রলেন। উপায়ন্তর না দেখে গভর্ণরেরা এই সমস্ত প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠদলের মধ্য থেকে মন্ত্রী নির্বাচন ক'রে অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠা ক'রলেন। নিয়মতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় থেকে মন্ত্রীসভা গঠন করা মানে হ'লো নিয়মতন্ত্রকে অভিবাদন ক'রে বিদায় দেওয়া। এই ঘটনায় আইন-পরিষদে প্রবেশের বিপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ত' উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লেন। কে, এম, মুন্সী ত' উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই ফেললেন—'জনসাধারণের ইচ্ছার প্রথম আঘাতেই' এবং 'একবিন্দু রক্তপাত না হ'য়েও' ১৯৩৫ সালের শাসনপদ্ধতি ভেঙ্গে প'ড়ল। রাজাজীর দল কিন্তু ভেঙ্গে প'ড়তে দেওয়ার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না—গান্ধীজিও ছিলেন না! ফলে চ'লতে লাগল ইংরেজ সরকারের দর কষাকষি: আমরা এতটা উঠেছি তোমরা কতটা নামতে পার? অবশেষে ভাইস্‌রয়ের বিবরণীতে ইংরেজ সরকার এই আপোষের বিষয়ে অনেকটা নেমে এলেন। এবং ভাইস্‌রয়ের এই বিবরণীকেই চরম ব'লে গ্রহণ ক'রতে তেজবাহাদুর শপ্রু প্রভৃতি উপদেশ দিলেন। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে এবং মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। খবরের কাগজের

সংবাদে প্রকাশ যে ওয়ার্কিং কমিটি সম্পূর্ণ একমত হ'য়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তা ভুল। প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হ'য়েছিল তিনজনের মতের বিরুদ্ধে—কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল, আচার্য নরেন্দ্রদেব ও অপর একজন সমাজতন্ত্রী নেতা অচ্যুত পট্টবর্ধন হ'লেন এই তিনজন। মতিলালের বিরুদ্ধে রাজাজী জিতেছিলেন গয়া-কংগ্রেসে, আজ জিতলেন জহরলালের বিরুদ্ধে। পনের বছর আগে যে অনাপোষী সত্যাগ্রহী আইন-পরিষদ গৃহকে পাপের লীলা-নিকেতন ব'লে মনে ক'রতেন, পনের বছর পরে তিনিই হ'লেন মাদ্রাজের প্রথম নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী।

এই যে পরিবর্তন এর কারণ কি? কারণ অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যায় যে রাজাজীর মনে ক্রমে এসেছিল কিছু ক'রবার ইচ্ছা—একটা গড়বার ইচ্ছা। শুধু ভেঙ্গেই আর তিনি আনন্দ পেতেন না। ভাঙ্গনে তাঁর একটা ক্লান্তি এসেছিল। এই ক্লান্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে তিনি অবলম্বন খুঁজতে লাগলেন। এই অবলম্বন খুঁজতে খুঁজতে তিনি অনেক বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছিলেন। বড় সিদ্ধান্ত ব'ললেই যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত মনে ক'রতে হবে তা নয় কারণ তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির বিচার হবে সময়ের মাপকাঠিতে। সিদ্ধান্তগুলি হ'লো আমাদের সমসাময়িক। সমসাময়িক কোন কিছুর নিরপেক্ষ বিচার সহজ নয়। মহত্তর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতকে যুদ্ধরত দেশগুলির অন্যতম ব'লে

ঘোষণা করা হ'লো এবং যুদ্ধার্থে ভারতে থেকে পূরো উদ্যমে লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা হ'তে লাগল। কংগ্রেস বললে, এ কিরকম ব্যাপার? ভারতের অনুমতি ব্যতিরেকেই ভারতকে 'যুদ্ধোরত' ব'লে ঘোষণা? এ অন্যায়! ইংরেজ সরকার ব'ললেন, এই অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত ক'রতে হলে কি ক'রতে হবে? তখন কংগ্রেস একটা ফিরিস্তি দিলেন। এবং ইংরেজ সরকারও একটা পাল্টা ফিরিস্তি দিলেন। এই নিয়ে চলল বাদানুবাদ, বিবৃতির পর বিবৃতি। এলেন স্যর স্টাফোর্ড ক্রাপস্ বৃটেনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে প্রস্তাব নিয়ে। ফিরে গেলেন প্রস্তাবের খসড়া বগলে পুরে। তারপর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অন্তর্হিত হ'লেন আহম্মদনগরের দুর্গে এবং আরম্ভ হ'লো আগষ্ট-আন্দোলন। এবং অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করার বিফল চেষ্টার হ'লো অবসান!

সাধারণের কাছে হয়ত, এ খবর অদ্ভুত ঠেকবে যে যুদ্ধ আরম্ভ থেকে ক্রীপস্ মিশনের বিফলতা অবধি কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে ক'রেছেন রাজাগোপালাচারী—মহাত্মা গান্ধী নন। কংগ্রেসের বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিক হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ভারত বৃটেনের করতল গত থাকা অবধি কখনও এই যুদ্ধের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রতে উপদেশ দেননি, বরং যুদ্ধের বিরোধিতাই ক'রে এসেছেন। ১৯৪১ সালে কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদ হঠাৎ সহযোগিতার জন্যে সর্তাবলী ভাইসরয়ের কাছে প্রেরণ করেন। ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব

পুনায় নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি গ্রহণ করেন। গ্রহণ করার অর্থ হ'লো গান্ধীজিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা। এই প্রস্তাব গ্রহণে বিশিষ্টতম অংশ গ্রহণ ক'রেছিলেন রাজাগোপালাচারী। রাজাজী হারিয়েছিলেন দেশবন্ধুকে, জহরলালকে আর এইবার হারালেন গান্ধীজিকে। এলেন স্যর স্টাফোর্ড ক্রীপস্। ক্রীপসের দৌত্যের পক্ষে কংগ্রেসের অনুকূল মনোভাব গ'ড়ে তোলবার পেছনেও কাজ ক'রেছে সি, আর এর ব্যক্তিত্ব, বৈদগ্ধ ও বুদ্ধিমত্তা। ক্রীপসের দৌত্যের বিফলতার পর কংগ্রেসের নায়কত্ব রাজাগোপালাচারীর হাত থেকে চলে গিয়ে গান্ধীজির কাছে আবার আশ্রয় গ্রহণ করল।

ক্রীপস্ যাবার পরও রাজাজী কেন্দ্রে শাসনের অংশ গ্রহণ ক'রে যুদ্ধে ইংরেজের সহায়তা করবার আশা মন থেকে জলাঞ্জলি দেননি। ক্রীপস্ যাওয়ার পরই তাঁর সভাপতিত্বে মাদ্রাজ আইন-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যেরা এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি হ'লো মুস্লীম লীগের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী মেনে নেওয়া হোক এবং তৎকালীন পরিস্থিতির উপযোগী এক কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করবার জন্যে মুস্লীম লীগের সহযোগিতা কামনা করা হোক। এই প্রস্তাবটিই আবার দিন পনের পরে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটির সভায় পেশ করা হয়, সেখানে প্রস্তাবটির সপক্ষে ভোট দেন মাত্র ১৫ জন, বিপক্ষে যান ১২০ জন।

এই ঘটনার পরই রাজাজী প্রথমে কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদ থেকে পদত্যাগ ক'রলেন এবং পরে কংগ্রেসের সঙ্গে সকল রকম সম্বন্ধ ছেদ ক'রলেন এবং মুস্লীম লীগের দাবীর স্বপক্ষে নিজের ঐ মতামত প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

তারপরের ঘটনা হ'লো গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার। মুস্লীম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা আপোষের জন্যেই এই সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারের মূলে ছিল রাজা-গোপালাচারীর ফরমূলা। গান্ধীজি প্রথমে এই ফরমূলার বিপক্ষে ছিলেন এবং ব'লেছিলেন......"ভারতকে খণ্ডিত করা পাপ।" পরে গান্ধীজি রাজাজীর এই মীমাংসার হ'লেন প্রধান সমর্থক। রাজাজীর ফরমুলা তখন কোন কাজে আসেনি সত্যি, কিন্তু আজ র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ বাঁটোয়ারার ফলে ভারত ও পাকিস্থানের যে রূপ দাঁড়িয়েছে, রাজাজীর ফরমূলার রূপের সঙ্গে তার বিশেষ তফাৎ নেই। গান্ধী-জিন্না পত্রাবলী ও সি, আর ফরমূলা যখন প্রকাশিত হয় তখন রাজাজী সেই পুস্তিকার ভূমিকায় লিখেছিলেন যে কোন সৎ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'তে পারে না। মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা ঐ উক্তির যাথার্থ্যই প্রমাণ করে। কংগ্রেসের নীতি অনুসারে ভারতও আজ অখণ্ড নয়, মুস্লীম লীগের দাবী অনুসারে আসাম, বাংলা ও পাঞ্জাবের সমস্তটাই পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজাগোপালাচারীই কঠোর সত্য সবার

আগে দেখতে পান এবং তার সম্মুখীন হওয়ার সাহসও তাঁর কোন অংশে কম নয়।

এই সব ঘটনায় জনসাধারণের মনে তাঁর প্রতি প্রীতির বদলে জমে ওঠে বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষের সম্বন্ধে একটা ঘটনাতেই খানিকটা পরিষ্কার ধারণা হবে। ১৯৪৬ সালে একদা দেবতা-বিশেষ রাজাজীকে তামিল-কংগ্রেস মনোনীত ক'রতে রাজী হ'লোনা এই অজুহাতে যে তিনি কংগ্রেসের নিয়মিত সভ্য নন। কংগ্রেস-সভাপতির আসন থেকে আজাদ নির্দেশ দিলেন—রাজাজীর নেতৃত্ব গ্রহণ কর। মদ্রদেশীয়েরা কংগ্রেস সভাপতির কথাও কানে তুললে না। তখন রাজাজীকে নেওয়া হ'লো কেন্দ্রীয় সরকারে ও পরে পাঠান হ'লো পশ্চিম বাংলার গভর্ণর ক'রে। পশ্চিমবঙ্গবাসীরা অনেক অসন্তুষ্ট হ'লো। রাজাজী হবেন গভর্ণর! রাজাজী গভর্ণর হলেন এবং আস্তে আস্তে পশ্চিমবঙ্গবাসীরা হ'য়ে উঠল তাঁর নিদারুণ ভক্ত। তারপর খবর বেরুল যে রাজাজী হলেন গভর্ণর জেনারেল। এতে লোকে আনন্দ প্রকাশই কর'ল। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই অভিমত যে রাজাজীর মনোনয়ন যোগ্যতম মনোনয়ন। এই ঘটনা থেকে একটা জিনিষ প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্রনীতিতে জনপ্রিয়তা হ'লো সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী এবং জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি অতি দুর্বল। সুতরাং রাষ্ট্রনীতিতে বাস্তববাদীরা উপদেশ দেন—'ঘাবড়াও মৎ, দো রোজ বাদ সব ঠিক হো যায়গা।' এই 'দো রোজ'

যিনি ঠিক থাকতে পারেন তিনিই সব ঠিক ক'রতে পারেন।

তাঁর সরল জীবনযাপনের বিষয় উল্লেখ ক'রে ভবিষ্য-কালের কোন ঐতিহাসিক হ'য়ত তাঁকে সুলতান নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে তুলনা করবেন। যখন তিনি মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী তখনও তিনি নিজের হাতে নিজের কাপড় কাচতেন; ক্রমে অবশ্য কাজের চাপে ঐ কাজ ছেড়ে দিতে হয়।

বক্তা হিসেবে রাজাজীর তুলনা মেলা ভার। সারা বক্তৃতায় একটিও বাজে কথা পাওয়া যায় না, একটিও অতিরিক্ত শব্দ ব্যয় নেই। শব্দ বিষয়ে এই মিতব্যয়িতা অবশ্য তাঁকে কখনও সাধারণের বক্তা হিসাবে পরিচিত করেনি। তাঁর লেখাও তাঁর বক্তৃতার ছাঁচে গড়া। কি লিখতে হবে এবং কতটুকু লিখতে হবে এটা রাজাজীর চেয়ে পৃথিবীর ক'জন লেখক ভাল বোঝেন তা সন্দেহের বিষয়! লেখায় তাঁর সাহিত্যিকের প্রতিভা ছড়িয়ে আছে প্রতি ছত্রে। অনেকে অবাক হন এবং ভাবেন—আহা রাজাজী যদি শুধু সাহিত্য নিয়েই থাকতেন! তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় আর একটি বিষয় আছে তা হ'লো তীব্র সমালোচনার সঙ্গে হাস্যরস ও বক্রোক্তির অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রণের ফলেই তাঁর রচনা হ'য়ে ওঠে অননুকরণীয়।

এই অননুকরণীয় সমালোচনার একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পর যখন মন্ত্রীসভা গঠন

নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজ গভর্ণরদের মতের মিল হ'লোনা তখন ঐ সমস্ত প্রদেশে অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সরকারের আয়ুকাল ছিল মাত্র ৬৫ দিন। অন্তর্বর্তী-মন্ত্রীদের অনেকে গভর্ণরদের প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে উল্লেখ ক'রে তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেন। এই প্রসংশার বোধকরি এই উদ্দেশ্যই ছিল যে কংগ্রেসকে বোঝান যে গভর্ণরেরা প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে 'হস্তক্ষেপ করিবেন না'—এইরকম প্রতিশ্রুতি না দিলেও সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করেন না। এই সব উচ্ছ্বসিত প্রসংশা শুনে রাজাজী এক বিবৃতি দিলেন: "ভারতের সমস্ত অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভা তাঁদের কাজে গভর্ণরদের হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন। ৬৫ দিনের সার্কাস তাঁদের কাছে এই কথা স্থির নিশ্চিত ক'রে দিয়েছে যে তাঁরা যদি সিংহের মুখের ভেতরে মাথাও ঢুকিয়ে দেন, তবুও সিংহ কামড়াবে না; সে যাই হোক সার্কাসের কর্মচারী ও পোষা সিংহদের বিষয়ে যে কথা সত্য কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকার সম্বন্ধে সে কথা সত্য নয়।"

কায়েদে আজাম্ জিন্না

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন স্কুল-পাঠ্য কেতাবে অনেক মহাপুরুষের জীবনী পড়েছি। জীবনীকারেরা মহাপুরুষের মহত্ব পরিমাপ ক'রতে গিয়ে প্রায়ই এই কথা ব'লতেন, "ইনি যদি কয়েক শতাব্দী পূর্বে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে ইঁহার পক্ষে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব ছিল না।" কায়েদে আজাম্ এই কথাই প্রমাণ ক'রে গেছেন যে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে কয়েক শতক পূর্বের পরিবেশের প্রয়োজন হয় না। আজ এই বিশ শতকেই, এই আণবিক বোমার যুগেই এক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। এসেছিলেন সাধারণ অবস্থা থেকে, করে গেলেন এক অসাধারণত্বের স্থষ্টি। শেরশাহ ছিলেন একজন জায়গীরদারের পুত্র। পিতা তাকে তাড়িয়ে দিলেন জায়গীর থেকে; ভাগ্যান্বেষণে চ'ললেন শেরশাহ—বসলেন দিল্লীর তক্তে। দিল্লীর মসনদে ব'সেই ক্ষান্ত হলেন না, এমন সব সংস্কার ও প্রবর্তন ক'রতে সুরু ক'রেছিলেন যে আকবর দি গ্রেটের গ্রেট্ হবার পথ হ'য়ে উঠেছিল সুগম। আকবরের মহামতিত্ব কতটা শেরশাহের জন্যে তা ঐতিহাসিকেরা পরিমাপ ক'রে উঠতে পারেন নি। পারবার কথাও নয় কারণ মহত্ব ত' আর পদার্থ নয় যে মাপলেই হবে।

এইরকম ভাগ্যান্বেষী রাষ্ট্রনায়কদের কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায়—প্রাচীন ও সাম্প্রতিক উভয়েরই। রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে সঙ্গে বোধকরি প্রাচীন ইতিহাসের যবনিকা পাত হ'য়ে নূতন যুগের সুরু হ'য়েছে। তার আগে অবিশ্যি গ্লোরিয়াস্‌ রেভোলিউশন্‌ দেশজয়ীদের গ্লোরি খানিকটা ম্লান ক'রে দিয়েছিল।

এরকম বলার কারণ হ'লো—রবার্ট ক্লাইভ পর্যন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রের বা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন তরবারির সাহায্যে এবং নিজেরাও ছিলেন অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং সৈন্যচালনায় পারদর্শী। রবার্ট ক্লাইভ পর্যন্ত পলিটিক্সের দ্বন্দ্বের সবসময়ে চূড়ান্ত মীমাংসা হ'ত অস্ত্রের দ্বারা। তখন তখন রাজনীতি ছিল, রাষ্ট্রনীতি ছিল না। এবং পৃথিবী ছিল মস্ত বড়।

রাজার যে নীতি সেই হ'লো রাজনীতি। তাঁরা স্বামীকে ফাঁসি দিয়ে স্ত্রীকে জায়গীর দিতেন, আঙুলের ইঙ্গিতে রাজ্যের যে কোন লোকের মাথা দেহ থেকে সরাতেন আর যার মাথা সরবার কথা তার মাথায় হ'য়ত মুকুট পরিয়ে দিতেন।

পৃথিবী ছিল বড় অর্থাৎ দিল্লী থেকে বাংলায় আসতে লাগত দু' মাস—দিল্লী মেলে দেড় দু' দিন বা ডালমিয়া জৈনের কৃপায় ২।৪ ঘণ্টায় নয়। বিলেত থেকে আসতে হ'ত, কেপ কলোনী ঘুরে, তিনমাসে।

এই বড় পৃথিবীতে রাষ্ট্রনীতির স্থান প্রকৃতপক্ষে নেই,

আছে রাজনীতির। রাষ্ট্রনীতির তখনই উদ্ভব হয় যখন তার প্রয়োগের ক্ষেত্র হয় স্বল্পপরিসর—ছোট দেশ বা ছোট পৃথিবী। এত ছোট পৃথিবী যে যাতে জহরলাল হোয়াইট্ হলে ক্যাবিনেট মেম্বারদের সঙ্গে দেখা ক'রে ৩০ ঘণ্টায় দিল্লীতে আবার ক্যাবিনেট মেম্বারদের সঙ্গে দেখা ক'রতে পারেন। এই এই রাষ্ট্রনীতির যুগে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা ক'রতে হয় অন্যভাবে এবং কি ভাবে কায়েদে আজাম তা দেখিয়েছেন অনন্যসাধারণরূপে।

প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে দু' একজন মনস্বী ছিলেন যাঁরা নিজেরা অস্ত্রশস্ত্রের ধারে না ঘেঁসলেও ঢালের পেছন থেকে সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়িয়াছেন; একজনকে তক্ত থেকে নামিয়ে আর একজনকে বসিয়েছেন, সিংহাসনের পেছনে থেকে রাজার হস্ত চালনা ক'রেচেন। চাণক্য, গিয়াসুদ্দিন বলবন, ওয়ালপোল ও নানা ফারনবিশ হ'লেন এই শ্রেণীর মনস্বীদের মধ্যে। চাণক্য বিরাট; মৌর্য সামাজ্য স্থাপনার ইতিহাসে চাণক্যের দান অপরিমেয়—কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে তিনি ম্লান ক'রে দিতে পারেন নি; তেমনি ওয়ালপোল, গিয়াসুদ্দিন বলবন বা নানা ফারনবিশের কৃতিত্ব তদানীন্তন ইতিহাসের সুরু ও শেষ নয়। কায়েদে আজাম জিন্নার পাকিস্থান সৃষ্টিতে কিন্তু তিনিই সুরু ও শেষ। ফুটবলের উপমা দিতে গেলে ব'লতে হয় যে নিজের গোল থেকে বল টেনে নিয়ে গিয়ে স্কোর ক'রে এখন য়ুনিফর্ম বদলে, গোলে এসে ডিফেন্স ক'রছেন। সৃষ্টিত' হ'লো, এখন সৃষ্টিকে বাঁচাতে হবে!

কায়েদে আজাম ছিলেন মিঃ মোহম্মদ আলি জিন্না যেমন মহাত্মা গান্ধী ছিলেন মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। একজন প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার তিনি, বিখ্যাত ধনী-কন্যাকে বিবাহ ক'রে জিন্না বিখ্যাতভাবেই জীবনযাপন ক'রে এসেছেন। রাষ্ট্রনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ চিরকালই ছিল, এবং কংগ্রেসের ছিলেন তিনি একজন খ্যাতনামা সদস্য। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও তিনি অনেকদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রনীতিকে রাজকীয় উদাসদৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রে এসেছেন। পলিটিক্স হ'লো শিক্ষিত ও অভিজাতদের বিলাস; এতে আনন্দ আছে কিন্তু আবেগ নেই—এই ছিল তাঁর মনোভাব। শোনা যায় যে তিনি প্রস্তাব এনেছিলেন যে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ না হ'লে যেন কংগ্রেসের সভ্য না করা হয়। মন্দলোকে আরও একটা কথা রটায় যে একবার তিনি পোষাকের ভাঁজ খারাপ হ'য়ে যাবে ব'লে কংগ্রেসের মাটীতে বিছানো সভামণ্ডপে ব'সতে অস্বীকার ক'রেছিলেন। ক্রমে তিনি বিলাসকে কর্তব্যে পরিণত করেন এবং রাষ্ট্রনীতির মধ্যে মুসলমান জনসাধারণকেও এনে ফেলতে চান। এটা ঘটে কিন্তু অনেকদিন পরে।

ভারতে প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব চিরকালই ছিল। জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতে একটি মাত্র জাতি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা বিশেষভাবে করলেও হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধের ইতিহাস বিপরীত

সাক্ষ্যই দেয়। 'ধর্ম জাতি গঠনের পক্ষে কোন প্রয়োজনীয় উপাদান নয়'—একথা ভারতবর্ষের প্রতি প্রযোজ্য নয়। জাতীয়তাবাদীরা যখন ব'লতেন যে ভারতে একটিমাত্র নেশন্ আছে তখন বিরুদ্ধবাদীরা ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ দেখাতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ ক'রতেন না। ধর্মান্ধতা ভারতে এত বেশী যে ধর্মের সঙ্গে সংঘাতে জয়ী হ'য়ে 'নেশন' গোছেন যে একটা গালভরা ভাব গ'ড়ে উঠবে তা সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক মিলন মাঝে মাঝে ঘটলেও তা হ'য়েছে ক্ষণস্থায়ী এবং উদারদৃষ্টিসম্পন্ন দেশভক্তকে ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ততদিন আকাশকুসুমই থাকবে যতদিন না পরিবেশের পরিবর্তন হয়। খিলাফৎ-আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমান হাত মিলিয়েছিল এবং একই বক্তৃতামঞ্চ থেকে একই কথার প্রতিধ্বনি ক'রেছিলে জোর গলায়; কিন্তু খিলাফৎ হ'লো ক্ষণস্থায়ী তাই খিলাফৎ হ'লো ব্যতিক্রম—এবং ব্যতিক্রম কোন নিয়মেই প্রবর্তন করেনা।

হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের ধর্মান্ধতা বেশী এবং গুরু বা মৌলভীর অনুশাসনের বেড়ার মধ্যে তারাই থাকে বেশী—একথা অনস্বীকার্য। যখন ইংরেজরা ক'রলে ভারতজয় এবং ইংরেজী শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির প্রচার ক'রতে সুরু ক'রলে তখন মৌলভীরা উপদেশ দিলেন, 'ঐ আওতা থেকে দূরে থাক···।···ইংরেজী শিক্ষা আমাদের সর্বনাশ ক'রবে।'

এইরকম উপদেশ দেওয়ার দু'টি কারণ ছিল। প্রথম হ'লো, ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকেই এদেশ কেড়ে নিয়েছিল, তাই মৌলভীদের মধ্যে এবং সাধারণ মুসলমানের মধ্যেও শাসকসম্প্রদায়ের অভিজাতমূলক ভাবটা ছিল পূর্ণমাত্রায় বর্তমান; আর হ'লো, ইংরেজরা শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছিল সত্যি কিন্তু ধর্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেনি অথচ ধর্মশিক্ষা ছিল মুসলমানদের শিক্ষার অঙ্গ। তাই তারা এইরকম সেকুলারাইজড্ এডুকেশনের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে পারলে না। মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষাই হ'লো তাদের একমাত্র অবলম্বন। এই সব মক্তব ও মাদ্রাসার নামে অনেক অহিমা বা জমিজমা ছিল। এই জমিজমা থেকে যা আয় হ'ত, সেই আয়েতেই মক্তব ও মাদ্রাসা চ'লত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সব জমিজমা বাজেয়াপ্ত ক'রলেন। এবং ফলে অনেক মক্তব, মাদ্রাসা বন্ধ হ'য়ে গেল এবং এইরকম হওয়ার ফলে মুসলমানরা চ'ল্ল অধোগতির পথে। স্যর উইলিয়াম হান্টারের কথায়, "কাল তারা ছিল বিজয়ী ও শাসক সম্প্রদায়, আজ তাদের পক্ষে বেঁচে থাকাই হ'লো কঠিন।……তারা হ'য়ে উঠল একটা জাতি যাদের ঐতিহ্য অতি গৌরবময় কিন্তু বর্তমানে যাদের পক্ষে জীবনধারণই হ'য়ে উঠল একটা বিরাট সমস্যা… ……একশ পঁচাত্তর বছর আগে বাংলাদেশে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া ছিল বিশেষ কঠিন, কিন্তু বর্তমানে তার পক্ষে ধনী হওয়া একান্ত অসম্ভব।"

মুসলমানদের যখন এইরকম অবস্থা তখন এলেন তাদের পরিত্রাণকর্তা স্যর সৈয়দ আমেদ খাঁ। তাঁরই ডাকে মুসলমানরা সুপ্তি থেকে জেগে উঠল। কামাল আতাতুর্কের মত তিনি ভারতের 'সিক্' সম্প্রদায়ের সিকনেস্ দূর করবার জন্যে অভূতপূর্ব চেষ্টা ক'রলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলিগড়ের এম্, এ, ও কলেজ, পরে যা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'য়েছিল, মুসলমানদের আত্মবিস্মৃতি ঘুচিয়ে দিলে। তারা বুঝতে পারল যে তারা কেবল আন্এম্প্লয়েড্ নয়, বিদ্যা ও শিক্ষার অভাবে আনএম্প্লএবল্ও বটে। আলিগড়ের য়ুরোপীয় অধ্যাপকেরা মুসলমানদের চোখের ছানির ওপর নিপুণ হস্তে অস্ত্রোপচার ক'রলেন, ফলে তারা হ'য়ে উঠল চক্ষুষ্মান। সুরু হ'লো তাদের মধ্যে নবজাগরণ!

স্যর সৈয়দ আমেদ তাদের জাগিয়ে ছিলেন কিন্তু তাদের মাতালেন কায়েদে আজাম, যদিও তার আগে খিলাফতে তারা একবার মেতেছিল। সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানরা কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্মা হ'য়ে যায়নি, যদিও মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি নিজেদের এর জড়িয়েছিলেন। আস্তে আস্তে মুস্লীম লীগ যখন কংগ্রেস থেকে দূরে স'রে গেল তখন এই সমস্ত নেতাদের অনেকে লীগের শান্ত, শীতল আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে নঙ্গর ফেললেন। জিন্না হ'লেন এঁদেরই একজন। হিন্দু ও মুসলমান যাতে হাত মেলায় তার জন্যে একসময় তিনি এমন চেষ্টা ক'রেছিলেন

যে সরোজিনী নাইডু তাঁকে ব'লতেন 'হিন্দু-মুসলমান মিলনের দূত।' দৌত্যকার্য ছেড়ে দিয়ে ক্রমে তিনি হ'য়ে উঠলেন মুসলমানদের প্রধান সেনাপতি।

সৈয়দ আমেদ পথ বাতলে দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সে পথ দিয়ে হাঁটতে গেলে চাই মরাল্ এনারজিয়ম্ বা বিবেকানন্দের কর্মযোগ। কায়েদে আজাম এই কর্মযোগ ক'রলেন সরবরাহ মুসমানদের মধ্যে। ভার্সাইএর সন্ধির পর পরাজিত জার্মেনীর এই রকম মরাল এনারজিয়মের প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছিল; এবং তা জুগিয়েছিলেন এড্‌লফ্ হিটলার। কর্মযোগের ফলে জার্মেনী বড় হ'য়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা আমন্ত্রণ ক'রেছিল অশিবকে!

সংঘবদ্ধ করার এবং সংঘঠন করার ক্ষমতা জিন্নার চেয়ে আর কোন ভারতীয় নেতার বোধ করি নেই। সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে তাঁর কতকটা তুলনা হ'তে পারে। তুলনার সময় একটা কথা মনে রাখতে হবে যে প্যাটেলের পেছনে ছিলেন কংগ্রেস ও গান্ধী-নেহেরু-আজাদ-রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত সহকর্মীগোষ্ঠী, কিন্তু জিন্না গ'ড়েছেন সহকর্মীর দল এবং তারপর তাঁদের চালিয়েছেন নিজের অঙ্গুলি ইঙ্গিতে।

একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে তাঁর কর্মে অধিকাংশ সময় তিনি উৎসাহ পেয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে কিন্তু জিন্নার হ'লো এইখানেই কৃতিত্ব যে তিনি কোন সুযোগ বা কোন উৎসাহকেই ব'য়ে যেতে দেননি। ইংরেজ

সরকারের মুখপাত্রদের এক একটি উৎসাহমূলকবাণীকে কাজে লাগিয়ে জিন্না দশ লক্ষ মুসলমানকে নিজের পতাকাতলে সমবেত ক'রেছিলেন প্রত্যেকবার।

কংগ্রেস ব'লতে অনেক নেতার কথাই একসঙ্গে স্মরণ হয় কিন্তু মুশ্লীম লীগ ব'ললে প্রথমে মনে পড়ে কায়েদে আজামকে। জোৎস্না রাত্রে প্রথমেই চোখ যায় চাঁদের দিকে, তারপর হয়ত খেয়াল হয় দেখা যাক্ আকাশে কি রকম তারার মেলা! ক্রীপস্ মিশনের সময় একজন বিদেশী সাংবাদিক এই ভাষা ব্যবহার করেছিলেন "মিঃ জিন্না এবং তাঁর মুশ্লীম লীগ"—মুশ্লীম লীগ ও তাঁর প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্না নন। একটি সংবাদ পত্রে তাঁকে উপহাস ক'রেছিল এই ব'লে—"ওয়ানস্ প্রেসিডেন্ট অলওয়েজ্ প্রেসিডেন্ট" অর্থাৎ মুশ্লীম লীগের সভাপতির বদল হয় না। বদল করার প্রয়োজনও হয়নি বরং বদল করা ছিল বিপদজনক। ক্রীপস্ মিশন্ থেকে মাউণ্টব্যাটেন-প্ল্যান পর্যন্ত তিনি অদ্ভুতভাবে লীগকে পরিচালনা ক'রে এসেছেন। লীগকে ইংরেজ সরকার অনেকদিন ধ'রে পরোক্ষভাবে পালন ক'রে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরাই হ'য়ে গেলেন অবাক ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের রূপ দেখে।

কংগ্রেস ছাড়ার পর থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কায়েদে আজাম কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন বটে তবে কংগ্রেসকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে পারেন নি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের আগে ও পরে জিন্না হ'য়ে দাঁড়ালেন অন্দরে কংগ্রেসের প্রধান

প্রতিপক্ষ। এর আগে অবশ্য তাঁর বিখ্যাত 'চোদ্দটি সর্ত্তের' প্রস্তাব ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে অন্যতম বিখ্যাত নিদর্শনপত্র। এটা নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা যে এই চোদ্দটী সর্ত্তের তেরটিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গৃহীত হ'য়েছিল ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন পদ্ধতিতে। তের হ'লো ইংরেজদের পক্ষে একটা অশুভ সংখ্যা। অশুভকে দিয়ে তাঁরা জিন্নাকে বরণ ক'রে ভারতের আন্দোলনের শক্তি হরণ ক'রতে চেয়েছিলেন; হরণ ক'রতে পারেননি সত্যি কিন্তু ভারতের পক্ষে—'দি ডেভিল হ্যাড্ হিজ্ ডে।'

১৯৪০ সালে যখন তাঁর নেতৃত্বে লাহোর-প্রস্তাব লীগ কর্তৃক গৃহীত হয় তখন ভারতের অনেকে হেসে ছলেন—প্রস্তাবের পরিণতির কথা স্মরণ করে; কায়েদে আজামও হেসেছিলেন তবে সে ঠিক উলটো কারণে—প্রথমোক্ত দলের হাসির পরিণতির কথা স্মরণ ক'রে

তীক্ষ্ণ আইনজ্ঞ তিনি রাষ্ট্রনীতিকে আদর্শবাদের আওতা থেকে এতদূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে মেকিয়াভেল্লির নীতির, যে পরিণতি পন্থাকে ভুলিয়ে দেবে, প্রায় কাছাকাচি গিয়ে প'ড়েছিলেন।

ক্ষমতা-হস্তান্তরের প্রস্তাবের পর মিঃ জিন্না যখন গভর্ণর-জেনারেল হ'লেন তখন অনেকের তাক লেগে গেল। পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে গভর্ণর-জেনারেলের কি দাম আছে? পার্টি, ট্যুর ও গভর্ণমেণ্ট হাউসের সংবাদের বাইরে গভর্ণর-

জেনারেলের যে গতায়াত নেই! ডোমিনিয়নের বড়লাটদের চেনেই বা কে? ডোমিনিয়নে প্রধান মন্ত্রীর প্রধানত্বের কাছে বড়লাটের বড়ত্ব যে ছোট হ'য়ে গেছে। স্মাট্‌সের খবর প্রায়ই সংবাদপত্রে বেরোয় কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণর-জেনারেল কে, সংবাদপত্র তা জানায় না। তেমনি ম্যাকেঞ্জি কিংএর কথা জানি, চিফ্‌লির কথাও জানি কিন্তু ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণর-জেনারেলকে জানতে হ'লে অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রতে হবে—হ'য়ত বা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতেই ছুটবে হবে। ডোমিনিয়নের বড়লাট যে কতকটা সাক্ষীগোপালের মত, একটি সংবাদপত্র নাড়ুগোপালও ব'লেছেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। জিন্না হাত বাড়িয়ে নাড়ু খেতে রাজী হ'লেন? জিন্না ব'ললেন, নাড়ুগোপাল সত্যি, তবে একটু তফাৎ আছে। আমি কেবল হাত বাড়িয়ে নাড়ু খাবার গোপাল নই, প্রয়োজন হ'লে নাড়ু দেবার গোপালও বটে। অর্থাৎ সাক্ষীগোপালের সাক্ষীর স্থানে থাক্‌তে হবে এমন কোন কথাই নেই, প্রয়োজন হ'লে এজ্‌লাসে এসে জেরাও করা যেতে পারে।

পাকিস্থানের পক্ষে এইরকমই প্রয়োজন ছিল। পাকিস্থান হ'লো নবগঠিত রাষ্ট্র; তার ওপর এই শিশুর ওপর এসে প'ড়েছে অভূতপূর্ব চাপ—দাঙ্গার, খাদ্যাভাবের, অর্থনীতির ও পররাষ্ট্রনীতির। এমন একজন লোকের দরকার ছিল যিনি হবেন দলগত বিরোধিতার ওপরে কিন্তু আবার মেজরিটির মেজর অবলম্বন। জিন্না দেখলেন যে তাঁকেই নিতে হবে

এই পদ, ক'রতে হবে এইকাজ ; সর্বময় কতৃ ক ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার অসহায়তা এমনভাবে মেশাতে হবে যে নিয়মতন্ত্রে যেন নূতন নিয়মের প্রবর্তন হয়। তাই কায়েদে আজাম শুধু বড়লাট নন—তিনি হ'লেন মুস্লিম লীগের ও পাকিস্থান গণ-পরিষদের সভাপতি।

সেণ্টাল ফরওয়ার্ড খেলেছিলেন তিনি। অনেকক্ষণ খেলার পর একক চেষ্টায় বল টেনে নিয়ে গিয়ে স্কোর ক'রলেন। স্কোর ক'রলেই হ'লোনা, ডিফেন্স খারাপ হ'লে গোল শোধ হ'য়ে যেতে পারে, তাই তাড়াতাড়ি বদলালেন য়ুনিফর্ম এবং গোলে এসে স্থান অধিকার ক'রলেন। গোল থেকেই দলকে পরিচালিত ক'রতে লাগলেন, ওদিকে ক্লিয়ার করো, ওকে পাশ করো, থ্রো ক'রে দাও ইত্যাদি। নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হ'লেন না—মাঝে মাঝে গোলে বল ধ'রে হাতে ক'রে পেনাল্টী সীমানার বাইরে এসে পরে পায়ের অদ্ভুত কেরামতি দেখিয়ে আক্রমণের সূচনাও ক'রছেন। এরকম খেলোয়াড়ের খবর পৃথিবীর ইতিহাস আর জানেনা !

"অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম,
চেন কি তাদের ভাই ?
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরি বল্গা নাই !

* * * *

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম,
আমি যে তাদের চিনি।
দুই তুরঙ্গ তাহাদের রথে, উদ্ধত উদ্দাম,
শোন তার শিঞ্জিনী।"

সপ্তর্ষি ছাড়া এঁরাও আছেন

সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে

গান্ধীজ্ রিলিজিয়ন্ এণ্ড পলিটিক্স—রাধাকৃষ্ণাণ

গাণ্ডী ইন্ সাউথ্ আফ্রিকা—হফ্ মেয়ার

লীডারস্ ওফ্ ইণ্ডিয়া-ভল্যুম ১, ২—মেহেরালী

ইণ্ডিয়াজ্ কনস্‌টিটিউশন্ এ্যাট্ ওয়ার্ক—চিন্তামনি ও ম্যাসানি

পার্লামেণ্টারি গভর্ণমেণ্ট ইন্ ইণ্ডিয়া—বি, পি, সিং রায়

এ্যান অটোবায়োগ্রাফি—জহরলাল নেহেরু

" " —গান্ধী

ডিস্‌কভারি ওফ্ ইণ্ডিয়া—নেহেরু

হুইদার ইণ্ডিয়া — "

দি কমিউন্যাল ট্রাঙ্গেল ইন্ ইণ্ডিয়া—অশোক মেটা এ্যাণ্ড অচ্যুত পটবর্ধন

দি ইণ্ডিয়ান্ মুসলমানস্—স্যার উইলিয়ম হাণ্টার

এ নেশন্ ইন্ মেকিং—স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

ওয়ান উইক্ উইথ্ গান্ধী—লুই ফিসার